১ম বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩১৯। [৪র্থ সংখ্যা।

November, 1912.

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক—শ্রীসত্যসাধন চেল ও শ্রীভবতারণ দাস।

"অতিথি" কার্য্যালয় ২৩।১ নং শঙ্কর হালদারের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০] [এই সংখ্যার মূল্য /০ আনা।



উচিত মূল্য ! খাঁটি জিনিস !

কে, এম, এহিয়ার কৃত।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাসুগন্ধিযুক্ত পরীমার্কা কন্নৌজ আতর গোলাপী, মতিয়া, হেনা, খস্, বকুল প্রতি শিশি ।৵, ।৵০, ॥৵০, ১৲ টাকা। শুধু তাই নয়, নিম্নলিখিত তালিকা দেখুন—

কেশবাহার তৈল	প্রতি শিশির মূল্য		॥৵০	আনা
কুন্তল বিরাজ তৈল	ঐ	"	৸০	"
চামেলী, বেলা ও হেনা তৈল	ঐ	"	।/০	"
গোলাপ নির্য্যাস	ঐ	"	।০	"
তরল আলতা	ঐ	"	৶০	"

মৃগনাভির জরদা তামাক এক কৌটার মূল্য ।০ আনা।

দাদের মলম এক কৌটা মূল্য ৵০ আনা।

হরেক রকম গোলাপ জল, আতর, ফুলেলা অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য ও লক্ষ্ণৌর জরদা তামাক, সুরতি গুলি ইত্যাদি এই সকল দ্রব্য খুচরা ও পাইকারী একদরে বিক্রয় হয়। পাইকারী স্বতন্ত্র। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কে, এম, এহিয়া
পারফিউমার্স।
২১৩ নং বহুবাজার মোড়, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় 'অতিথি'র নামোল্লেখ করিবেন।

কিলবরণ কোম্পানির



ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বলবাসী অনেকেরই সীলেট চূণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধাজনক নয় মনে করিয়া অপর চূণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টিমারে বুক করিয়া দিই এবং যাঁহারা নৌকা করিয়া চূণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় পাঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকটবর্ত্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চূণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

কিলবরণ এণ্ড কোং

এজেণ্টস্—৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

সূচী।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি" ॥

অতিথি—শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য।

"অতিথি" কাহারা ছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজ এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অতিথি বলিলে, অনেকে ভিখারীকে বুঝিয়া থাকেন। এই ভ্রমের মূল আধুনিক সংস্কৃত-বিদ্যাধ্যায়ী পণ্ডিতমণ্ডলী; কেন না, তাঁহারাও ইহা রচনা করিয়া বলেন "অতিথি বালকশ্চৈব দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" আরো দাও, আরো দাও: যেমন বালকেরা যাচ্ঞা করে—অতিথিও তাই করিয়া থাকে, তবেই উক্ত কথার তাৎপর্য্যে ভিখারীকে বা ভিক্ষার্থীকেই বুঝাইল। বাস্তবিক কি অতিথি অর্থে ভিখারী? কখনই না। অতিথি শব্দের উৎপত্তি ন তিথি দিন অর্থাৎ যে দিনে তিথি নাই—তিথি নাই, এমন দিন জগতে নাই; এ জগতের সমুদয় দিন-ই কালের মধ্যে এবং তিথিগত। অতএব কালের বাহিরে যাহা আছে, তাহাই অতিথি। কালের বাহিরে কি আছে? তথায় ব্রহ্ম আছেন। এইহেতু অতিথি অর্থে ব্রহ্ম। কুশরাজার পুত্রকেও অতিথি বলা হইত। হিন্দুগণ এক্ষণে সে অতিথিকে হারাইয়াছেন; কাজেই অতিথিকে ভিখারী বলিয়া বসিয়াছেন। যদি আবার অতিথি শব্দটি এবং তাহার তাৎপর্য্য "অতিথি" পত্রের কল্যাণে হিন্দুসমাজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র পত্র সমাজের অসীম কল্যাণ সাধন করিল, বলিতে হইবে। প্রথমতঃ শব্দটীকে সমাজে চালাইলেই ক্রমে উহা হইতে ভাব আসিবে, গাঢ়ভূতি ভাব হইতে স্পষ্টানুভূতি আইসে, তৎপরে তাহা সাকারত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতিথি কাহারা? তাহা আমরা এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে দেখাইব এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি, তাঁহারা কেমন লোক ইত্যাদি এই প্রবন্ধে বলিব। অদ্য একটি অতিথির পরিচয় দিব। ইঁহার নাম শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য। মলবর প্রদেশের অন্তর্গত কালাদিগ্রামে ইঁহার জন্মস্থান ও নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতীদেবী, কেহ কেহ বশিষ্ঠাও বলিয়াছেন। শিবগুরু নম্বরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণেরা চাকুরী করুন, অথবা ব্যবসায়

করুন ইঁহাদের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় না। মলবর প্রদেশে কিন্তু এ প্রথা নাই, তথাকার ব্রাহ্মণেরা ধনবান হইলে কিম্বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে সেই সকল ব্রাহ্মণকে নম্বরী ব্রাহ্মণ বলা হয়।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জন্ম, সন লইয়া মতদ্বৈধ দেখা যায়। ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন—

"নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক বহ্ন্যাব্দ শিবতামগাৎ॥"

সাহেবেরা এই শ্লোকের অর্থ করেন, "নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে" অর্থাৎ ৩৮৮৯ কল্যব্দে সুতরাং ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হয়। (কলির অব্দ পঞ্জিকা দেখিয়া নির্ণয় করুন) পরন্তু এই কল্যব্দের অন্য নাম যুধিষ্ঠির অব্দ। ভগবান শঙ্করাচার্য্য-কৃত সারদা-মঠের আচার্য্য পরম্পরায় যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে "যুধিষ্ঠির শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুক্ল পঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।" ২৬৩১ যুধিষ্ঠির অব্দ হইলে খৃষ্টজন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া পড়ে, কাজেই শেষপক্ষের মতে ৬৫৩ বৎসর পূর্ব্ব পক্ষের সহিত পার্থক্য হইয়া থাকে। মোটের উপর এই উভয় মতের কোন মীমাংসা আমরা এখনও পাই নাই।

তৎপরে ভগবান শঙ্করাচার্য্য মাতৃগর্ভে প্রবেশের দিন, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ভূত চতুর্দ্দশীর দিন গ্রামের এক শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়া ব্রাহ্মণী সভক্তিতে তদ্‌গদচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবতার নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, "হে মহাদেব! তোমার মত আমার একটি পুত্র সন্তান লাভ হউক।" প্রগাঢ় ভক্তি এবং আন্তরিক বলবতী ইচ্ছায় তাঁহার মনের ছায়া প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তাহাতে তিনি দর্শন করিলেন যেন প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ হইতে একটি জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল। কেহ কেহ বলেন, এই দৃশ্য তথাকার পুরোহিত মহাশয়ও সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই দিবস হইতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মাতাঠাকুরাণী গর্ভবতী হইলেন। তাহার পর ২৮০ দিন পরে পুণ্যাহ বৈশাখের শুভশুক্ল পঞ্চমীতিথিতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভূমিষ্ঠ হন। জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, ইহাঁর নামকরণে তাঁহার পিতা শঙ্করের প্রসাদ বলিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন শঙ্কর।

শঙ্করের জন্ম পত্রিকা করান হইল; সর্ব্বনাশ! তাহাতে দেখা গেল, এই বালক আটবৎসর মাত্র জীবিত থাকিবে। পিতা হতাশ হইলেন! পুত্রের উপর

ভালবাসা কমিয়া গেল। এজন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। ছেলে এদিকে প্রথম বর্ষেই পিতার নিকট বর্ণপরিচয় পড়া শেষ করিলেন, দ্বিতীয় বর্ষে মাতার নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিয়া পুরাণ পাঠ শেষ হইল, তৃতীয় বর্ষে শঙ্কর পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতৃদেব এই বর্ষে স্বর্গারোহণ করিলেন। শঙ্কর অনাথ বালক হইলেন। তৎপরে চতুর্থ বর্ষে ইনি বেদ-পাঠের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু কোন অধ্যাপক উপবীতহীন বালককে বেদপাঠ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কেন না হিন্দুশাস্ত্র মতে যতদিন উপনয়ন না হয়, ততদিন তিনি দ্বিজ হইতে পারেন না। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝায়। পরন্তু এই তিন বর্ণের উপবীত হইত,এখনও হিন্দুস্থানে তাহাই হইয়া থাকে। শূদ্র অর্থে স্লেভ, নিগ্রো বা চাকর যাহারা চাকরাণীর গর্ভে জন্মে, যাহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কার নাই, দেবতা পূজায় অধিকার নাই, যাহাদের গুরু পুরোহিত নাই, যাহারা অসভ্য বর্ব্বর তাহাদের শূদ্র বলা হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা উপনয়নের উপকরণ ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে উপনয়ন দিবেন? কে ভগবানের ভগবান হইবেন? এমন সৌভাগ্য কাহার হইবে? সুতরাং শঙ্করের গুরু খুঁজিয়া মিলিতেছিল না, তাঁহার পৈত্রিক কুলের কুলগুরু বংশে কেহই ছিলেন না। বিষম সমস্যা।

একদিন শঙ্কর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে খেলা করিতেছিলেন, তথায় একটা মৃত্তিকা স্তূপ ছিল। অন্যান্য বালকেরা মাঠের শুষ্ক পত্রাদি একত্র করিয়া সেই স্তূপের উপর রাখিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আমোদ করিতে থাকে। উক্ত স্তূপের গায়ে একটা গর্ত্ত ছিল,তাহাতে একটা সর্প বাস করিত; সে অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইয়া বালকদিগকে তাড়া করিল। শঙ্কর উহার ফণাটি হাত দিয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই কাণ্ড পথিমধ্যে এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন "যদি তোকে সাপ্টা কামড়াইত, তাহা হইলে তুইতো মারা যেতিস্!" উত্তরে শঙ্কর কহিলেন "যদি আমাকে কামড়াইত, তাহা হইলে আমি একাই মরিতাম, অন্য সকলের কিছুই হইত না। যদি একের প্রাণ দিয়া দশকে বাঁচান যায়, তাহাতো আমার পক্ষে মঙ্গলের কথা।" তেজস্বী বালকের এই কথা শুনিয়া, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কহিলেন, "শঙ্কর! দশকে বাঁচাইতে হয়, একথা ইহার মধ্যে অর্থাৎ এত অল্পবয়সে তুমি বাবা বুঝিয়া ফেলিয়াছ? আয় শঙ্কর, আমি তোকে মন্ত্র দিব ও উপবীত

দিব, তোর উপবীত লইবার উপযুক্ত জ্ঞান হইয়াছে। আমরা এই যে অখণ্ড-মণ্ডলাকার পৃথিবীর গর্ভে রহিয়াছি, শঙ্কর ইহাকেই প্রকৃতি কহে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্তদ্বারা আকাশ এবং মাঠের চারিদিক দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ শঙ্কর! ঐ যে সূর্য্যোদয় হইতেছে, উনিই সবিতা—উনিই গায়ত্রী—আর্য্যের দেব-দেবী অদ্ভুত কিছুই নয়—সব সত্য—এস তোমায় উপবীত দিয়া তাহা দেখাইয়া দিব।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শঙ্করকে বাটী লইয়া গিয়া তিনিই শঙ্করের হোতা, তিনিই শঙ্করের আচার্য্য ও তিনিই শঙ্করের তন্ত্রধারক হইয়া বিনাব্যয়ে শঙ্করের উপবীত এবং দীক্ষা দিয়াছিলেন। কল্যব্দ ২৬৪৬ শকে চৈত্রমাসে শুক্ল নবমীতে শঙ্করের উপবীত ও আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষা হইল। তৎপরে গোবিন্দস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট ইনি বেদপাঠ করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা কহিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে উপবীত দিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু হন নাই, জগৎগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবার গুরু হইবে কে? এজন্য ইঁহারা শঙ্করের গুরু খুঁজিয়া পান না। অর্থাৎ ইঁহারা সে কল্পনা করেন না, একারণ ইঁহারা বলেন, ভগবান শঙ্করাচার্য্য "ব্রহ্মদ্বৈত" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়াছিল, তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না, আমাদের ধারণা তখনও উপবীত ও দীক্ষা একসঙ্গেই হইত।

যাহা হউক, শঙ্করের উপবীত হইল, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেন; বেদপাঠ সমাপ্ত করিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল, তিনি আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিতেন না, মন বড়ই উদাস ও বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িল, সন্ন্যাস লইবার জন্য তিনি তাঁহার মাতাকে বারম্বার বলিতেন। কিন্তু মা' তাহা গ্রাহ্য করিতেন না, "ননীর পুতুল, তুই আমার খেলাঘরের সামগ্রী, তুই আমার সৃজিত বস্তু, তোর সাধ্য কি যে, তুই আমাকে ফেলে যাবি।" যেমন ছেলে তেমনি মা। মহা বৈজ্ঞানিক শঙ্কর মা'র কথা লঙ্ঘন করিতেন না, এখনকার ছেলেদের মত সে সময় কেহই মা' বাপের অবাধ্য হইতে পারিত না। শঙ্করের সন্ন্যাসে বাধা পড়িল।

এমন সময় একদিন শঙ্কর মা'র সঙ্গে নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। শঙ্করকে কুমীরে ধরিয়া অগাধ জলে টানিয়া লইয়া গেল, মা' কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটে অন্যান্য যাঁহারা স্নান করিতেছিলেন, সকলেই

ভয়ে তীরে উঠিয়া 'হায় হায় কি হইল' বলিয়া খেদ আরম্ভ করিলেন; শঙ্কর সেই অগাধ জল হইতে বলিলেন, "মা তুমি কেঁদনা, আজ আমাকে কুমীরে ধরেছে, কিন্তু মা' ইহার বহু পূর্ব্বে তোমায় আমায় এজগতে যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, উৎপন্ন হইয়াছে, জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকলকে "কালে" ধরিয়াছে। সেই কালও এই কুমীরের মত একদিন সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইবে মা' যদিও কুমীরের হাত হইতে বাঁচা যায় কিন্তু কালের হাত হইতে কি ক'রে বাঁচা যায় মা? তাই বলি, এখনও বল মা, আমাকে সন্ন্যাস লইতে দিবে? যদি দাও তাহা হইলে আমি এই কুমীর এবং কালের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।" মা ভাবিলেন "ছেলে সন্ন্যাস লইলে তো বাঁচিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া মা কাতর ক্রন্দনে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "আয় বাবা শঙ্কর! আমার দেহের অংশ—প্রাণের অংশ—আমার কুলের অংশ—কূলে আয়—আমি তোকে সন্ন্যাস লইতে দিব।" মা'র কথা শুনিয়া শঙ্কর গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের মা দৈববাণী শুনিলেন যে, তোর ছেলে কূলে ফিরিবে, যাহা হউক তৎপরেই শঙ্কর এক ঢেউতে কূলে পৌছিলেন,—মা'র কোলে আসিলেন এবং মা'কে বলিলেন "মাগো! তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্রী নিশ্চয় তাহা আমি জানি; মা' তোমার ইচ্ছায় গড়া ছেলেকে কুমীরের নিকট থেকে বাঁচাবে বলিয়া কাঁদিলে কেন? মা' তোমার শক্তিতে আমি বাঁচিয়াছি! মা' আমি আটবৎসর বাঁচিব, একথা কোষ্ঠির লেখা; তুমি তজ্জন্য চিন্তিত ছিলে, পিতৃদেব তজ্জন্য অমরলোকে গিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য হইয়াছে, আজ আমার সেই আটবৎসর—সেই ফাঁড়া কাটিয়া গেল, আজ আমার নবজীবন, আজ তুমি আমার নূতন মা' হ'লে, আজ আমি নূতন মা'কে পেলাম। ইহা শুনিয়া মা' বলিলেন "তাতো বটেই, কিন্তু শঙ্কর! তোর নূতন মা'র আজ্ঞা—তুই সন্ন্যাসী হ' আর যাই হ', মা'কে ছাড়িতে পারিবিনি!" শঙ্কর কহিলেন, "না মা', তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে ছাড়া যায় না।"

এইবার শঙ্কর সত্যের অতিথি হইলেন। উপবীতের সময় সকলকেই অতিথি হইতে হয়, কিন্তু সে সময়ের অতিথি আত্মীয় স্বজনের নিকট ভিক্ষা করে। আজ শঙ্কর সত্যের অতিথি—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া বাটীর বাহির হইলেন। কল্যাব্দ ২৬৩৯ কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী তিথিতে তিনি মাতৃ পদরেণু মস্তকে লেপন করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি লইয়া কাশীতে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন। ইনি শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন, ইহাঁর ধর্ম্মমত ছিল,

"অদ্বৈতবাদ"। ইহাঁর লিখিত "বেদের ভাষ্য" অদ্যাপিও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রণীত বৈরাগ্য বিষয়ক সংস্কৃত স্তোত্র অতি বিখ্যাত। ভারতের চারিদিকেই ইনি মঠ স্থাপিত করিয়া তাৎকালীন হিন্দু বালকদিগের পড়িবার সুবিধান করিয়াছিলেন। এই সকল মঠ তখনকার সময়ে কালেজ বিশেষ ও ভিক্ষু আশ্রম ছিল। এখন যেমন লেখাপড়া শিক্ষা অর্থ ভিন্ন হয় না, এখন আর বিদ্যা অমূল্য ধন নহে, কিন্তু তাঁহার সময়ে যথার্থ বিদ্যা অমূল্য ধন ছিল, ছাত্রদিগের বেতনাদি লাগিত না, তদ্ভিন্ন ছাত্রেরা মঠে বা টোলে থাকিবার স্থান পাইত এবং বসন ও ভোজন পাইত। টোলের সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার্থীরা অদ্যাপিও ঐ নিয়মে থাকেন। কিন্তু হিন্দুসমাজে উপবীত ভিন্ন কোন ছাত্রকে টোলে পড়ান হয় না, পরন্তু বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির উপবীত লইবার প্রথা নাই, তবেই উপবীত ভিন্ন তখনকার সময়ে বিদ্যা-শিক্ষাই হইত না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ভারতব্যাপী শিষ্যমণ্ডলী অদ্যাপিও দেখা যায়। ইহাঁর সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। ইনি যখন ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যত হন, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড পড়িয়া তন্ত্রমতের করণকারণ ও কাপালিক লইয়া তন্ত্র সাধন কেবল কাশীতে কেন সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজ মধ্যে খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ তন্ত্রমত নহে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্মের অতি প্রাচীন তন্ত্রমত বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য অনেকে বলেন, ইহাঁদ্বারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ধ্বংস পাইয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকরাশি রচিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং এখনও হইতেছে, বাঙ্গালায় যোগিসমাজে শঙ্করভাষ্য মুদ্রিত হইতেছে। কাশী, গয়া, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থধামে অদ্যাপিও শঙ্কর মঠ রহিয়াছে। ইহাঁর কর্ম্মজীবন এত দীর্ঘ যে, হাজার হাজার বৎসর হইল ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহার কর্ম্মজীবন হীনপ্রভ হয় নাই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

আত্মতত্ত্ব।

"যদবিদ্যাবিলাসেন ভূতভৌতিকসৃষ্টয়ঃ।
তং নৌমি পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥"

কত দীর্ঘদিন, মাস, বৎসর—কত জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিলাম, কত পুত্র-কলত্র, কত ধন-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম—আবার আসক্তি টানিয়া আনিল—দিন গেল—ঐ আবার কাণের কাছে পরপারের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল—মৃত্যুর ভীমদণ্ড শিরোদেশে বিঘূর্ণিত—করাল কাল সবলে কেশাকর্ষণ করিতেছে—শত অনুনয়, বিনয় ও অর্থের প্রলোভন—কিছুতেই সেই বিনয়বধির নির্দ্দয় কৃতান্ত তিলমাত্র দয়া করিল না। বিষয় বৈভব—পুত্র-কলত্র—কৈ কিছুই ত সঙ্গে গেল না—রিক্ত হস্তে এসেছিলাম আবার রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া গেলাম, কাজ ত কিছুই হইল না। দিবাবসানে পথিক যেমন নিশাযাপনোদ্দেশে পান্থশালায় অবস্থান করে, তত্রত্য জনগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করে পরে আবার একাকী স্বীয় গন্তব্যপথে গমন করে—এ সংসারও সেই পান্থশালা। কত আসিতেছে, পুত্র-কলত্র বিত্তাদি উপভোগ করিতেছে আবার সকলই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

জলাশয় বক্ষে, যেমন একটীর পর একটী—তার পর আর একটী, এইরূপ ক্রমশঃ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে আবার পরক্ষণেই সেই অগণিত ঊর্ম্মিমালা কোথায় চলিয়া যাইতেছে—সেইরূপ প্রতিনিয়ত এই সংসার-সমুদ্রে কত প্রাণী আসিতেছে কত অনন্তের কোলে মিশিয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? কে বা এই প্রহেলিকাময় অনাদি অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এই মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া আপনহারা হইয়া পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণ, ভোগ-বিলাসিতায় এবং স্বার্থসাধনে যেরূপ চিন্তা করি—ধন-ঐশ্বর্য্য চিন্তায় যেরূপ কালব্যয়িত করিয়া থাকি, যদি এই চিন্তা ক্ষণকালের জন্য সেই পরমপুরুষের কৃপালাভার্থ করিতে পারিতাম তাহা হইলে কি মৃত্যুর গম্ভীর আরাব শ্রবণে মন এত ভীত বা চঞ্চল হইত?

কাল অবিরাম গতিতে স্বকার্য্য সাধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—

ঐ যে পশ্চিম গগনে সবিতৃদেব রক্তচক্ষু করিয়া তোমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেছেন, আর বলিতেছেন—"ঐ দেখ, কাল, তোমার একটী দিন অপহরণ করিল—মূঢ়! সাবধান হও—তুমি কালকে উপেক্ষা করিতেছ—নিদ্রা, ক্রোধ, আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া কালের ভ্রূকুটী কুটীল মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছ না—কিন্তু কাল তোমাকে উপেক্ষা করিবে না, শত শত মুদ্রা বিনিময়ে তুমি বিন্দুমাত্রও কৃপালাভ করিতে পারিবে না।"

মোহান্ধ জীব! এই দুর্লভ জীবন কি বৃথা ব্যয় করিবে? এ জীবনের কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? অবিদ্যার আপাতমনোহারিণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া—রিপুগণের উত্তেজনায় উদ্বেজিত হইয়া সারাটি জীবন কি এই ভাবে অতিবাহিত করিবে? অবিদ্যা বা মায়া বড় প্রগল্‌ভা, মুখরা, কুটীল পাপপথাভিলাষিণী; তাঁহার সৌন্দর্য্য বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী, দর্শনে চক্ষু ঝলসিত হয়, রূপানলে মনপতঙ্গ পুড়িয়া মরে—বিদ্যুৎপ্রতিম সৌন্দর্য্যের মধ্যাগত বজ্রাগ্নির ন্যায় কুটিলা। মানব! যৌবনমদে মত্ত হইয়া যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আর কামনাবহ্নিতে পতঙ্গবৎ ঝম্প প্রদান করিও না! চিরদিনই কি তোমার জীবনোদ্যানে যৌবনকুসুম বিকসিত থাকিবে? ঐ দেখ—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর—তোমাকে উপহাস করিতে করিতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; তোমার যৌবন, তোমার কমনীয় কান্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অবিমৃশ্যকারিতার শাস্তিপ্রদানে উদ্যত হইয়াছে। তুমি জীবকুলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াও কেন এই মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছ? এ পথে শান্তি নাই, সুখ নাই, বিমল আনন্দও নাই—এখানে কেবল রূপের জ্বালা, ভোগের তৃষ্ণা—উদ্দাম লালসার উৎকট গন্ধ—এখানে কেবল আকাঙ্ক্ষা, কেবল অশান্তি—এ বাসনার তৃপ্তি নাই, নিবৃত্তি নাই, ঘৃত সংযুক্ত অনলের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অহরহঃ মানবচিত্তকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ভ্রাতঃ! জীবনের লক্ষ্য স্থির কর—শত প্রলোভন শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হও—হৃদয় শান্তিরসে অভিষিক্ত হইবে, মন বিমলানন্দে পরিপূর্ণ হইবে। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানরাশি দূরে পলায়ন করিবে। সে রূপরাশি দিব্য চক্ষে একবার নিরীক্ষণ করিলে আর চক্ষু অন্য পদার্থে আকৃষ্ট হইবে না। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথিনীর মুখে যে সৌন্দর্য্য, নীহারকণ-বিহ্বল কুসুমাবলীর যে পবিত্রতা, সান্ধ্য গোধূলির যে উদার শান্ত ভাব আর অমানিশার যে গাম্ভীর্য্য, তাহা এই হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিভাত হইবে।

অবিবেকী মন! ঐ দেখ তোমার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। এ সমুদ্রে চেষ্টা ও অধ্যবসায় সহকারে যাহা সন্ধান করিবে তাহাই পাইবে। ইহা অমূল্য রত্নরাজি পরিপূর্ণ, কিন্তু নক্রমকরাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল—এই রত্নে সকলেরই তুল্য অধিকার—কৌশল-বর্ম্মে দেহাচ্ছাদন করিয়া অধ্যবসায়াস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে ঐ রত্ন গ্রহণ কর।

বহু সুকৃতি ও তপস্যাবলে প্রাণিজন্ম লাভ করা যায়। প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে পুরুষ, পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বেদবেদাচারী দুর্লভ। প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আলোচনা, বিবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও জ্ঞানালোকের অভাবে আবার কুপথগামী হইয়া থাকেন। বহু শাস্ত্রই পাঠ কর, দেবগণের আরাধনাই কর, অথবা অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব উপলব্ধি ভিন্ন মুক্তি সাধিত হইবে না। এই অদ্বৈত ভাব আত্মজ্ঞানলব্ধ; যেমন জলদ্বর্ত্তিকা অপরের সাহায্য ভিন্ন স্বপ্রভাবতঃ সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করিতে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশনে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈত ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। এই আত্মজ্ঞান কি উপায়ে লাভ করিতে পারা যায়, আমরা এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমি কে? এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? কে বা ইহার অধিষ্ঠাতা? এই প্রত্যক্ষীভূত জগতের কর্ত্তাই বা কে? ইত্যাদি বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা কোন না কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, সেই সিদ্ধান্তের বলে আমরা এই দৃশ্যমান মায়া প্রপঞ্চের স্রষ্টা এক অনাদি, অদ্বিতীয়, অনন্তবীর্য্য পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হই। সূর্য্যের ভাস্বান্ অবয়ব দর্শনে তাঁহার অনন্ত জ্যোতিঃ লোচনলোভন চন্দ্রের সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সৌম্য ও শান্তভাব, বিকসিত কুসুম দর্শনে তাঁহার হাস্য, ফেনিল নীল অম্বুধিবক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার গাম্ভীর্য্য, প্রজাপতি আদির বিচিত্র শিল্পখচিত পক্ষাবলী দর্শনে তাঁহার অদ্বিতীয় শিল্পকারিতা, বিহগকুলের মধুর কাকলী শ্রবণে তাঁহার অশেষ করুণার আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পুরাকালে মুনি ঋষিরা গভীর গবেষণা দ্বারা বিমল জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বৃত্তি হইতে নিরোধ করিতে হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিরাট সৃষ্টিকৌশলের আলোচনাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইত্যাকার চিন্তা দ্বারা চিত্ত নিরোধ করাই জ্ঞানলাভের একতম উপায়। যেমন সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার

সুদূরে পলায়ন করে, সেইরূপ এই অধ্যাত্ম জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অজ্ঞান দূরে গমন করিয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞান ধ্বংস সহজসাধ্য নহে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত বিধানে কর্ম্ম করিলেও অজ্ঞানের ধ্বংস হয় না, কারণ কর্ম্ম এবং অজ্ঞান বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে, উভয়ে একত্র বাস করিতে পারে, বিরোধিপদার্থ ভিন্ন একের দ্বারা অপরের ধ্বংস সাধিত হয় না—জলের দ্বারা যেমন অগ্নির ধ্বংস, আলোকের দ্বারা অন্ধকারের ধ্বংস নিত্য সংঘটিত হয়, সেইরূপ কেবল জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে। যেখানে জ্ঞান সেখানে অজ্ঞান বা যেখানে অজ্ঞান সেখানে জ্ঞান থাকিতে পারে না ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত। যেমন পাক করিবার সমুদয় উপকরণ বর্ত্তমানেও অগ্নি বিনা তাহা সংসাধিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মাদি সাধন সত্ত্বেও জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

আলো ও আঁধার।

১

আলো কহে অন্ধকারে হাসি ;—"হে তিমির,
বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরিহার
আগে আমি তা'র পরে তুমি, সৃষ্টি হ'তে
'দিবা নিশি' প্রমাণ তাহার।"
অন্ধকার কহে ক্রোধ ভরে—"অন্ধ বলি
আছে মোর চির অপবাদ,—
কিন্তু তোর দূর দৃষ্টি নেহারি আলোক,
অন্ধ হ'তে হয় মোর সাধ" ;

২

"বিশ্ব যবে হয় নাই—পড়ে কিরে মনে ?
অথবা সে জানিবি কেমনে !—
কত যুগ যুগান্তর ধরি', খেলিয়াছি
কত খেলা গগনের সনে !
চপলা বালিকা তুই—সেদিনের কথা
মোর পাশে পেয়েছিস্ ঠাঁই,
রূপ-মোহে গরবিনি ! খেয়েছিস্ আঁখি,
প্রবীণারে তুচ্ছ ভাব তাই !

৩

তমসার তীব্র তিরস্কারে, নত মুখে—
মেঘ কোলে লুকাইল আলো।
তমঃ জানি নিজ রণ জয়,—জুড়ি' বসি'
ধরাখানি ক'রে দিল কালো।
সহসা সে মেঘমন্দ্রে—উঠিল জাগরি'
কর কার ভাতি দিক চয় ;—
"আমি চির অন্ধকার, হে ভ্রান্ত আঁধার,
আমি পুনঃ চির জ্যোতির্ম্ময়।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উদ্ভাবনবাদ।

(Theory of Evolution)

(১)

শস্যশ্যামলা নানা জীবাবাস অশেষ-রত্ন-সমন্বিতা ধরা দেখিয়া সকলেরই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ চৈতন্যরূপিনী কোন দেবী সশরীরে বর্ত্তমানা। কবির চক্ষে নয়, ভাবুকের ভাবনায় নয়, ভক্তের হৃদয়ে নয়; ঐতিহাসিকের ইতিবৃত্তে, দার্শনিকের গবেষণায়, পাদার্থিকের সূক্ষ্মতায়, এই বিশাল দিগ্বসনা মেদিনী মূর্ত্তিমতী সজীবা। যাহার বিশাল দেহে সৃষ্ট জীবমাত্রেই আশ্রয়লাভ করে, যাহার অসীম বিমানস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ হইতে দীব্য-ক্ষীর নির্ঝরিণী প্রধাবিত হইয়া জীব-জীবন বিধান করে, সেই সর্ব্বাধারভূতা বসুন্ধরা জননীসমা নহে কি? এহেন মহীয়সী মাতৃরূপিনী মহাদেবী কবে কি প্রকারে কোন্ কারণে আবির্ভূতা হইয়াছেন? ঐতিহাসিক! তোমার পুরাবৃত্তে সে কাহিনী কই? পৌরাণিক! তোমার পুরাণ গ্রন্থে কি সে বর্ণনা আছে? ধর্ম্মশাস্ত্র! তুমি সর্ব্বমান্য, এ সম্বন্ধে কি সংবাদ দিয়াছ?

ঐতিহাসিক অনেক চেষ্টার পর বলিলেন, 'ইহা আমার সাধ্যাতীত; আমি অত দূরবর্ত্তী সুবৃহৎ সংবাদ রাখিতে সমর্থ নই; মানবজাতি অন্ততঃ তাহার অধিকাংশ অংশ যে পূর্ব্বে একস্থানে একত্রিত ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পর্য্যন্ত দিতে আমি সক্ষম।' পৌরাণিক দাঁড়াইয়া বলিলেন—'যেহেতু আমি পুরাণ আমার ও সকল বিষয়ে একটা সংবাদ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমি জানি ভগবান্ নারায়ণ মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করতঃ তাহা-দিগের শারীরিক মেদ হইতে জলমধ্যে মেদিনী নামক স্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই পৃথিবী সজীবা দেবী, তাহার স্বর্গদেবের সহিত বিবাহ হয়, তাহাতে 'সাইক্লপ' (cyclop) নামে একচক্ষু দৈত্যগণের জন্ম হয়;—প্রভৃতি অনেক বিষয় আমি জানি।' অবশেষে সর্ব্বমান্য ধর্ম্মশাস্ত্র স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, আমি সকলই সঠিক অবগত আছি, যেহেতু আমি সর্ব্বজ্ঞ; আমাতে কিছুই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না, কারণ আমি সত্য স্বয়ম্প্রকাশ ঈশ্বর বাক্য; আমার কথা একমাত্র ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস কর। অদ্য হইতে প্রায় ছয় সহস্র বৎসর হইল, ঈশ্বর এক সময়ে কি জানি কেন, স—সৌর-মণ্ডল

পৃথিবী সৃজন করিয়া ফেলিলেন; কেবলমাত্র ছয় দিবসের মধ্যেই পৃথিবীস্থ যাবতীয় চেতনাচেতন উদ্ভিদাদি সৃজন করিয়া সর্ব্বশেষ অবিকল নিজানুরূপ মানবকে সৃজন করিলেন। ইহাই পৃথিবীর সৃষ্টি, উৎপত্তি বা জন্ম।

অসীম শক্তিশালী হইলেও, পাঠক! আমরা বিংশশতাব্দীর অসীম উপকরণ-ভূষিত জ্ঞানাভিমানী মানব; কারণহীন কার্য্যে আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, ন্যায়ানুগ বিচারসঙ্গত প্রতিজ্ঞা ভিন্ন অন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণে আমরা সম্মত নহি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণিত অস্তিত্ব ব্যতীত, অন্য স্বাভাবিক নিয়মের অস্তিত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। অতএব কি করি, যেরূপ ভাবে যত প্রকার অর্থই করা হউক না, উপরোক্ত কোন কথাতেই আমাদের আস্থা নাই।

(২)

সকলেই বলেন, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই ধারণা ঈশ্বর আমাকে, তোমাকে, যাবতীয় সর্ব্বস্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিরূপে, কেন, কোন্ স্থানে, তিনি এমন সৃষ্টি করিতে বসিলেন? সমস্ত একত্র সৃষ্টি করিলেন, না পৃথকভাবে সৃষ্টি করিলেন? আমাদিগের জীবনে কখনও দেখিতে পাই না, যে কোন মুহূর্ত্তে কোন একটী নূতন জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হইল; সমগ্র ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেও তেমন একটী প্রমাণ নাই। তবে তিনি কি যাবতীয় সৃষ্টি এক সময়েই করিয়াছিলেন—বুঝি সেই ছয় দিবসের মধ্যেই। জগতে ইতস্ততঃ প্রতিনিয়ত যতবিধ ঘটনা ঘটিতেছে, প্রত্যেকটী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই যে, কারণ ব্যতীত কোনও ঘটনা কখনও সম্ভবপর হয় না। যখন বর্ত্তমানে আকস্মিক বা কারণহীন ঘটনার সম্পূর্ণ অভাব, তখন অতীতেও সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই। অতএব কিরূপে কোন বিষয়ের অনৈসর্গিক, আকস্মিক সৃষ্টি হইতে পারে? অতি সুদূর অতীত হইলেও, কিরূপে এমন বৃহৎ পৃথিবী ও এতবিধ দ্রব্য নব নব ভাবে সৃষ্ট হইল বিশ্বাস করা যায়। সৃজন অর্থেই অসীম অর্থাৎ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাব; এই অনন্ত ভাণ্ডার পৃথিবীর আদি বা শূন্যাবস্থা কিরূপে ধারণ করা সম্ভব?

আবার ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অতি বিশাল ভৌমিক যুগ সকলের (Geological Ages) কতবিধ ধ্বংসাবশেষ চিহ্নদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অতি দূর দুরন্ত অতীত গহ্বরে আরও কত জাতি বিপুল ও ক্ষুদ্র জীব উদ্ভিদ সকল জন্মিয়াছে, বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহারা এক্ষণে স্বপ্নবৎ, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নাই। তজ্জন্য সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে, এখনকার জীব উদ্ভিদ

মাত্রেই কি সর্ব্বাদিতে বর্ত্তমান ছিল? বিপরীত পক্ষে বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহান্ কালপ্রবাহে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণী ক্রমোন্নতি দ্বারা উদ্ভূত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া শেষে এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে, ইহাই আমাদের বিচার্য্য-উদ্ভাবনবাদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল, পৃথিবী ও মানব কেবলমাত্র ছয় সহস্র বর্ষের পুরাতন। বদ্বীপ প্রভৃতির নির্ম্মাণ পদ্ধতি দেখিয়া, পৃথিবীর উপরিস্থ স্তর-বিন্যাস পরীক্ষা করিয়া, মহাদেশ মধ্যস্থ উচ্চ পার্ব্বত্যশৃঙ্গে সামুদ্রিক ধ্বংসাবশেষাদি অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, পৃথিবী এত অল্পকালের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। অপিচ পৃথিবীস্থ নানাবিধ স্তরে অত্যদ্ভুত জীব-কঙ্কালাবিষ্কারে অঙ্গারখনি প্রভৃতিতে উপর্য্যুপরি বহুস্তর উদ্ভিদ বিন্যাসে, পার্ব্বত্য ভূবিবরে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রাপ্তিতে নির্ব্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে মানব বর্ত্তমান অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে অনেকানেক ভৌমিযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; সেরূপ এক একটী ভৌমিক যুগেই আট দশ সহস্র বর্ষ নির্দ্দেশ করা বিধেয়।

(৩)

পৃথিবী অতীব পুরাতন মানবও পুরাতন। ইহাদের সৃজনসম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ আছে। ফলতঃ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী বাদ (theory) প্রচলিত হইয়াছে—একটী সৃজনবাদ অপরটী উদ্ভাবন-বাদ। প্রধানতঃ দুই নিয়মে জগৎ সংসার পরিচালিত হইতে পারে; ঐশ্বরিক (providence) ও শাক্তিক (law)। এই দুই মহান্ বাদের বিচার, সত্য নির্দ্ধারণ বা সম্যক্ প্রকাশ আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্যাতীত। ইহাদিগের সংক্ষেপ ভাবার্থ এই—সৃজনবাদ বা শাস্ত্রীয় মতে প্রত্যেক মৌলিক বস্তু বিভিন্নভাবে সৃজিত, নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট; ঈশ্বর তৎসমুদায়ের স্রষ্টা নিয়ন্ত্রাতা ও পোষক। প্রত্যেক ঘটনা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত অকাট্য অদৃষ্টবদ্ধ; সৃজনের সহিত ধ্বংসের বীজ সর্ব্বত্র সমাবিষ্ট—সৃষ্ট ক্রমে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। এই বাদের অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত, ত্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনেক ক্ষুদ্রতর বাদের সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ ইহার বিশ্বাসকারীরা অদৃষ্টবাদী জন্মান্তর বিশ্বাসহীন ও ভিন্নাত্ম—একোপাসক। মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি এই দলভুক্ত। উদ্ভাবনবাদ বা বৈজ্ঞানিক মত বলেন—উপস্থিত সমুদয় বিষয় পূর্ব্বতন বিষয় সমূহের সম্পূর্ণ নকলমাত্র এবং ভাবী বিষয় সমূহের কারণ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ ও ফলের মধ্যে এক

নিয়ম চিরন্তন বিদ্যমান; নিয়মই ত্রিলোকশাসক, অবিনশ্বর, হ্রাস বৃদ্ধি হীন; এক হইতে বহুত্ব, বহুত্বেই একত্ব। এ মতাবলম্বীরা ক্রমোদ্ভব নির্ব্বাণবাদী, কর্ম্মফল—জন্মান্তর বিশ্বাসী এক আত্মা সমষ্টি উপাসক। বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি এই দলভুক্ত।

অতএব এক্ষণে সুবিশাল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—জগৎ সৃষ্ট না উদ্ভূত?

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সিংহ সরস্বতী।

প্রতিশোধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিষণসিং চুপ্ করিলেন! তাঁহার নাসিকা দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। চক্ষু আগুনের মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কুমুদসিংহও ভীত হইলেন। বৃদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে কে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল। শোকে ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দন্তদ্বারা তিনি নিম্নোষ্ঠ বারংবার দংশন করিতে লাগিলেন। বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষঃস্থল বারংবার নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। কুমুদ সিং কেশরীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন—জলদগর্জ্জনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আজ আমি পিতৃব্যের এই অন্তিম-শয্যায় বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে ছলে বলে যে প্রকারে হউক কায়কোবাদের বক্ষরক্তে, একদিন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব!" গৃহের কোণে কোণে সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা অতি বিকট ভাবে প্রতিধ্বনিত হইল! সে কি ভীষণ! যেন বিভীষিকার পৈশাচিক হাস্য!

সহসা কিষণ সিং চীৎকার করিয়া উঠিয়াই নীরব হইলেন। কুমুদ সচকিতে দেখিলেন—বৃদ্ধ থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন; তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। কুমুদ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের মুখে জল দিলেন—কিন্তু জল মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইল না, দুই কস্ বহিয়া পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কিষণ সিংহের সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়া গেল! কুমুদ চীৎকার করিয়া, কাকা কাকা, বলিয়া কত ডাকিলেন,

কিন্তু আর কোন উত্তরই পাইলেন না। তখন বুঝিলেন—যে তাঁহার পিতৃব্য জন্মের মত এ মর-জগৎ ত্যাগ করিলেন। তিনি আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন দিবার শেষ। আঁধার গুটি গুটি করিয়া ধরাবক্ষে পা বাড়াইতেছিল। মর্ম্মাহতের দীর্ঘশ্বাসের মত মধ্যে মধ্যে এক একবার উত্তপ্ত বায়ু হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছিল!

নির্জ্জন—নীরব কক্ষে কুমুদ একাকী মৃত পিতৃব্যের শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট! নীরবে তিনি কত কাঁদিলেন। পিতৃব্যের অপরিসীম স্নেহ আদর, মিষ্ট কথাগুলি সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বড় অধীর হইয়া পড়িলেন! ব্যাকুল কণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে বলিয়া উঠিলেন—ভগবান! আমার এ কি করিলে? আমি ত কোন পাপ করি নাই প্রভু! কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই ত দেব! তবে কেন আজ আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে বিধাতঃ!

কুমুদ কত ভাবিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। তিনি কখন ক্রোধে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন, কখনও বা শোকে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; অস্থির হৃদয়ে পাগলের মত গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহার মূর্ত্তি বড় ভীষণ দেখাইতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত! সহসা তাঁহার শোকোচ্ছ্বাসব্যথিত হৃদয়ে ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একটা আশা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি অঙ্গরাখার মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্গ-যাত্রা কালীন তিনি যে অশ্বারোহী সম্ভ্রান্ত যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ পত্রখানি সেই যুবকপ্রদত্ত বাটীর ঠিকানা। কুমুদ ভাবিলেন, এই সম্ভ্রান্ত যুবকের নিকট একবার যাইয়া রাজার এই অত্যাচারের কথা সমস্ত বলিব। দেখি, তাঁহার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, তাহা হইলে তারাকে উদ্ধার করিব। তার পর প্রতিশোধ!

এই ভাবিয়া তিনি সেই মুসলমান যুবকের ঠিকানাটী দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা তিনি সর্পদষ্টের মত চীৎকার করিয়া কাগজখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্র মধ্যে দেখিলেন—জলন্ত অক্ষরে সাক্ষরিত—কায়কোবাদের নাম! কুমুদ সিং তাঁহার সমস্ত হৃদয় খানায় একটা ভীষণ কম্পন অনুভব করিলেন। এককালে যেন সহস্র বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডে কে আগুন ধরাইয়া দিল।

যেন তাঁহার আপাদমস্তকে কে বিষাক্ত সূচী বিদ্ধ করিয়া দিল! তিনি উন্মাদের ন্যায় উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কায়কোবাদ! আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই কি তার পুরস্কার? পিশাচ! এই তোমার প্রত্যুপকার?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর পাঠান রাজসভা! সদস্যপরিবেষ্টিত কায়কোবাদ রত্নখচিত বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট! দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী জালালুদ্দিন।* বাম পার্শ্বে কায়কোবাদের প্রাণের ইয়ার বা মন্ত্রী জাফর খাঁ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ! সভামধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। কখন রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক কখনও বা নানা প্রকার গল্প গুজব হইতেছিল। তখন মুসলমান রাজসভায় গল্প কৌতুকের চর্চ্চাটাই বেশী হইত। এইরূপে আলোচনা চলিতেছে এমন সময় জনৈক দ্বাররক্ষক সৈনিক আসিয়া, কুর্ণিস করিয়া সভামধ্যে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। জাফর খাঁ সকল কাজেই অগ্রগণ্য—কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে চায়—সে সর্ব্বাগ্রেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি সংবাদ সৈনিক?"

সৈনিক। জনৈক রাজপুত শাহানসাহ বাদসাহের সাক্ষাৎপ্রার্থী!

কায়কোবাদ কিছু সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন—রাজপুত আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী! —কে সে?

জালালুদ্দিন এতক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন—মার্জ্জনা করিবেন জাঁহাপনা, সে ব্যক্তি যেই হউক, রাজসভায় আসিলে সমস্তই জানা যাইবে। যাও সৈনিক, সেই রাজপুতকে সভামধ্যে লইয়া আইস। কায়কোবাদ, জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে বড় একটা কথা কহিতেন না, সুতরাং নীরবে রহিলেন। সৈনিক পুনরায় যথারীতি কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান করিল।

---

* মন্ত্রী জালালুদ্দিনের অপর একটী নাম ফিরোজ সাহ। তিনি প্রথমে বুলবনের মন্ত্রী ছিলেন, পরে কায়কোবাদেরও মন্ত্রী হয়েন। যতদিন তিনি মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন ততদিন লোকে তাঁহাকে ফিরোজ বলিয়াই জানিত। পরে যখন দাসবংশের পতনের সঙ্গে তাঁহার অবস্থার উন্নতি ঘটে, তখন তিনি জালালুদ্দিন খিলজি নামে অভিহিত হয়েন। আমরা এই নিম্নোক্ত নামই ব্যবহার করিব। 'অতিথি'র শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় জালালুদ্দিনের পরিবর্ত্তে ভ্রম বশতঃ গিয়াসুদ্দিন খিলিজি লিখিত হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

সকলে নবাগত অপরিচিত রাজপুতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সৈনিকের সহিত সেই রাজপুত সভামধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া কায়কোবাদ ও জাফর খাঁ উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন—রাজপুত আর কেহ নহে—কুমুদ সিং!

কুমুদসিংহের শরীর শীর্ণ—মস্তকের কেশরাশি রুক্ষ—চক্ষু ভয়ানক উজ্জ্বল! তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ঘোর উন্মাদ; সেই উজ্জ্বল চক্ষের তীব্র জ্যোতি বুঝি কায়কোবাদ ও জাফর মিঞার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিল, তাই তাঁহারা উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী জালালুদ্দিন তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। জালালুদ্দিন কায়কোবাদকে বড় ভাল বাসিতেন না। কায়কোবাদ কিরূপ স্বভাবের লোক তাহা তিনি জানিতেন তাই তিনি তাঁহার উপর সর্ব্বদাই সন্দেহ করিতেন। কুমুদ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া, নীরবে, একদৃষ্টে কায়কোবাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে কি তীব্র দৃষ্টি! কি অলৌকিক দীপ্তিময়, অন্তরদাহন চাহনি! কায়কোবাদ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা তীরের মত ছুটিয়া বাহির হইতেছে! তাঁহার স্ফীত নাসিকা হইতে যেন প্রলয়ের প্রচণ্ড বায়ু ছুটিতেছে। কায়কোবাদ কুমুদের সেই উন্মত্ত মূর্ত্তি অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর দুরু, দুরু, করিতে লাগিল। মুখ শুখাইয়া গেল! তিনি সভয়ে মস্তকটী অবনত করিলেন। কুমুদসিং তখন কর্কশকণ্ঠে ডাকিলেন—"কায়কোবাদ!"

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুরমণীগণের অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এতদ্ব্যতীত আমরা বৈদিক যুগে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই যে, তখন নারীজাতিকে বৈধব্য দুঃখ অনুভব করিতে হইত না। কারণ তখন বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অথর্ব্ব বেদে একস্থানে আছে "যদি কোন স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে দশজন অব্রাহ্মণ পতি থাকে পরে যদি একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তখন সেই ব্রাহ্মণই তাঁহার পতি বলিয়া

বিবেচিত হইবেন।" ৫—১৭—৮। এইরূপ প্রমাণের উপর যে আর কিছু বক্তব্য আছে, বলিয়া বোধ হয় না। এই উক্তির দ্বারা কেবল যে বিধবা বিবাহ ছিল বলিয়া অনুমান হয় তাহা নহে, তখন অসবর্ণ বিবাহেরও অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং এইরূপ বিবাহে নীচত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া কোন ইঙ্গিত না থাকায় তৎকালে এইরূপ বিবাহ সমাজ-প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এইরূপ প্রমাণ থাকা স্বত্বেও এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, আমাদের এখানে বিধবা বিবাহ কোন কালে প্রচলিত ছিল না। বরং ইহার পরিবর্ত্তে সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা ঋগ্‌বেদ হইতে একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, সহমরণ ছিল বিধবা বিবাহ ছিল না। সে ঋক্‌টী এই :—

ইমা নারী বিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সম্পৃশন্তাম্।

অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুবেশাঃ আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিমগ্নে ॥

অর্থাৎ "এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া ঘৃত ও অঞ্জনানুলিপ্ত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম রত্ন ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি মধ্যে আশ্রয় লউন"। কিন্তু যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী নহেন অর্থাৎ যাঁহারা বিধবা বিবাহ ছিল বলিয়া অনুমান করেন তাঁহারাও এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়া ইহার অন্য প্রকার অর্থ নিষ্পত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, ইহার অর্থ এইরূপ— "এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া উত্তম উত্তম রত্ন সমূহ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।" একই ঋকের এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার কারণ কি, হয়ত কাহার কাহার মনে উদয় হইতে পারে। উত্তর এই যে, ইহার কারণ এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঋকের "যোনিমগ্নে" লইয়া মতান্তর। এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, ইহা ঠিক যোনিমগ্নে পাঠই হইবে। ইঁহারা সহমরণের পক্ষপাতী। আর এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, না, উহা যোনিমগ্নে পাঠ হইবে না, উহার প্রকৃত পাঠ যোনিমগ্রে। ইঁহারা সহমরণের বিরুদ্ধবাদী। Maxmuller, Wilson, Cowell প্রভৃতি মনীষিগণ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। ইঁহারা এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য ইহার পরবর্ত্তী ঋক্‌টী (১০—১৮—৮) উদ্ধৃত করেন কিন্তু পূর্ব্ব সম্প্রদায় ইহাতে বলেন যে, যদিও উহা দৃশ্যতঃ সহমরণের বিরুদ্ধবাদী কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহার অর্থ ইহা নয়। এই ঋকের অর্থ সহমরণের অনুকূল; তাঁহারা বলেন, ঐ ঋকে পরীক্ষা করা

হইতেছে যে, রমণী প্রকৃত পক্ষে পতির অনুরাগিনী কি না। এইরূপ অর্থ করিয়া এই ঋক্‌কে তাঁহারা সহমরণের অনুকূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু আমরা এ মতের সহিত একতা স্থাপন করিতে পারি না। কারণ পর পর দুইটী ঋকে দুই রকম করিয়া ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তদ্ব্যতীত সায়নাচার্য্য তৈত্তরীয় আরণ্যকেও ঐ ঋকের অন্তর্গত 'দিধিষোঃ' কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্ত্রীর দ্বিতীয় পতি। অতএব সায়নাচার্য্যের মতে এই ঋকের ব্যাখ্যা এইরূপ—হে নারি, উত্থিত হও, তুমি যাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছ তিনি গতাসু হইয়াছেন; তোমার এই স্বামীর নিকট হইতে জীব জগতে ফিরিয়া আইস এবং যিনি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এবং তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন তাঁহার তুমি পত্নী হও; ১০—১৮—৮। অতএব আমরা দেখিতেছি যে বিধবা বিবাহ এক্ষণে যাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত তাহা সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে শাস্ত্রসম্মত ছিল। আমরা স্ত্রীলোকের এই সকল অধিকার হইতে দেখিতে পাই যে, তখনকার স্ত্রীজাতি অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতেন এবং সকলের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হইতেন।

এইবার আমরা বৈদিক যুগের ঠিক পরবর্ত্তী কালে নারীগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাই আলোচনা করিব। এই সময়টাকে ইংরাজীতে Epic যুগ বলিয়া থাকে। এ সময় আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ সময়েও তাঁহারা সেই বৈদিক যুগের ন্যায়ই সম্মানিত হইতেন; স্বাধীনতার বিমলানন্দ উপভোগ করিতেন; অবিবাহিতা থাকিলে পুত্ররূপে পণ্য হইয়া পিতৃধনের অধিকারী হইতেন প্রভৃতি বৈদিক যুগের সমস্ত অধিকার তাঁহারা এই সময়েও উপভোগ করিতেন। দুই একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহারা আরও অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা উৎসবাদি দর্শনার্থে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন; পূর্ব্ব পরিচিত বান্ধবদিগের আবাসে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য যাইতেন, পুনরায় তাঁহাদিগকে নিজের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিতেন; বিচারসভা, রাজসভা প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন এবং সময় সময় উপস্থিত সভ্যদিগের সহিত বিষম তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এইরূপ ভাবে সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করা এবং এ বিষয়ে সমাজের বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে এরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা সমাজগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ স্বাধীনতা হিন্দুরমণীর পক্ষে আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে এ প্রকারের স্বাধীনতা ত দূরের কথা, কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাও নাই। এখনকার সমাজ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিধান দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সেই প্রাচীনকালে এ সমুদায় অধিকার শাস্ত্রসম্মত ছিল বলিয়া দেখিতে পাই। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে আমরা মিথিলাধিপতি জনকের রাজসভায় সমবেত ঋষি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে মহর্ষি গর্গের কন্যা গার্গী বাচকবীকে দেখিতে পাইতাম না। কেবল কি দেখিতে পাওয়া? সমবেত ঋষিগণের মধ্যস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ককে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে শুনিতে পাইতাম না। এমন দৃষ্টান্ত কেবল যে এই একটী, তাহা নহে, এ প্রকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন; অতএব সে বিষয়ের উল্লেখে বিরত হইলাম।

এযাবৎ আমরা নারীজাতির অবস্থা বৈদিক যুগে এবং রামায়ণাদির সময়ে কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিলাম। এই আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই সুদীর্ঘ কাল তাঁহারা সমাজে থাকিয়া সকল বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন। তবে তখনকার স্বাধীনতা অবশ্য এখনকার পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ন্যায় ছিল না। তখনকার স্বাধীনতা উপভোগ হেতু আন্তরিক নির্ম্মলতা বিনষ্ট হইত না; সে স্বাধীনতায় মন আরও অধিক পরিমাণে মার্জ্জিত ও উন্নত হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করায় কাল প্রবাহে বাহিত হইয়া তাঁহারা এই বর্ত্তমান কালের অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন। সে সময় তাঁহাদের সম্মানও যথেষ্ট ছিল দেখিয়াছি। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বিবাহের জন্য কোন বাধ্যতামূলক বিধি না থাকায়—বাল্যবিবাহের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাত্রী স্বাভিলষিত পাত্রে আপনাকে উৎসর্গ করিতেন সুতরাং তখন অধিক বয়সে বিবাহ হইত। তাঁহারা পিতৃধনের অধিকারী হইতেন যদি না তাঁহারা বিবাহ করিতেন এবং যদি পিতার অন্য কোন পুত্র না থাকিত। উচ্চ শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। এ শিক্ষা যে কেবল গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্যলাভের শিক্ষা কিংবা যে পুস্তকাদি পঠনেই ইহার পরিসমাপ্তি হইত তাহা নহে; তাঁহাদিগকে কলাবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার প্রমাণ আমরা মহাভারতে প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে পাইতেন; গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এইখানেই স্ত্রীশিক্ষার শেষ নহে, তাঁহাদের রাজনৈতিক বিষয়েও কথা কহিবার অধিকার ছিল, ইহার প্রমাণ আমরা মহা-

ভারতের বিত্তুলার চরিত্রে দেখিতে পাই। এইরূপে আমরা যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা যে বেশ উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে সময়ে বিধবা বিবাহ বর্ত্তমান ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ বেদ হইতে কতিপয় ঋক্ও উদ্ধৃত করিয়াছি। বেদ ব্যতীত মহাভারতাদিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তখন অসবর্ণ বিবাহও বেশ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ভীমের সহিত হিড়িম্বার এবং অর্জ্জুনের সহিত নাগকন্যা উলুপীর বিবাহ কি তৎকালের সমাজপতিগণ সমর্থন করিতেন? আর যদি ইহা সমাজসম্মত না হইত তাহা হইলেই বা তাঁহারা এরূপ বিবাহ করিবেন কেন, তাঁহারা দেশের রাজপুরুষ, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারা কি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারেন? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তখন অসবর্ণ বিবাহ সমাজসম্মত ছিল। সে সময়ে নারীগণ নানা প্রকার সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রাচীন যুগে অবরোধপ্রথা ছিল না। ইহা পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক যুগে এবং রামায়ণাদির সময় সমাজের অবস্থা প্রায় এক রকম ছিল, বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; পরিবর্ত্তন পরে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং আমরা এইবার ইহার পরে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিব।

Epic যুগের পর হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব সহস্র বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত।

এইবার আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে, সময়ের একটা বিশেষ কোন নাম দেওয়া যায় না। তবে ইহার পরিমাণ কাল Epic যুগের পর হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এসময়ে স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বের ন্যায় সমাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেন ইহার প্রমাণ আমরা এই সময়ের স্মৃতি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হই। মনু বলেন :—

"পিতৃর্ভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমিপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈ তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধন্তে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যাময়ো যানি গেহানি—শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদাপূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ॥"

কেবল যে মনুই এই কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে; প্রায় সকল শাস্ত্রকারই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের নেতৃগণের উপর স্বার্থপরতা ততটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তখনও তাঁহারা যেমন নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন তেমনি কতকটা নারীগণের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র প্রভাবে এ ভাবটা তাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে বিধৌত হইয়া যাইতেছিল। ইহা এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিলে জানিতে পারি। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে,প্রকৃত পরিবর্ত্তন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এ সময়ে নারীগণ পূর্ব্বের ন্যায় দর্শনাদি পড়িতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইত। ইহার উল্লেখ আমরা শাস্ত্রাদিতে এবং অন্যান্য বিবরণে দেখিতে পাই। স্ত্রীশিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন অনেক কথাও আমরা নানা সংহিতায় দেখিয়া থাকি। কিন্তু এ সময়ে যে স্ত্রীস্বাধীনতা হরণরূপ একটী ভয়ানক বিধির প্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল ইহার দ্বারা ইহাই আভাষে বুঝা যাইতেছিল যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাপ্রভৃতি বিবিধ অধিকার যে চিরকাল বজায় থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং এই আভাষের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই পরবর্ত্তীকালের সমাজের নেতৃগণ স্ত্রীশিক্ষা একরকম বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ একজন যদি আর একজনকে নিজের অধীনস্থ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে এবং তাহাই করিয়া থাকে। সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে শিক্ষা দিতেও পারে এবং না দিতেও পারে। ইহা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রেও ব্যাপার তাহাই—যে দিন নারী নরের অধীন বলিয়া অনেকের মনে ধারণা হইল সেই দিনই নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা তরঙ্গতাড়িত তৃণের ন্যায় কোন দিকে ভাসিয়া গেল। এখন যদি পুরুষ ইচ্ছা করে তবে নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে এবং যদি ইচ্ছা না করে তাহা হইলে তাহার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ সে তখন অপরের বাধ্য। সুতরাং তাহার মতামতের এখন কোন মূল্য নাই। কিন্তু এরূপ ধারণা যে স্ত্রীস্বাধীনতা হরণ করা

মাত্রই যে নরের [illegible] আধিপত্য বিস্তার করিতে [illegible] হইয়াছিল তাহা নহে। সুতরাং এ সময়ের সম্বন্ধে ইহা যে একটা সমাজের পক্ষে সুখের বিষয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে [illegible] স্ত্রীস্বাধীনতা হরণ সে সমাজের পক্ষে একটা যে বিষম দুঃখের বিষয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সময়ে সামাজিক সুখ, দুঃখ জড়িত সুখ।

এই দুঃখজড়িত সুখ ক্রমে দুঃখেই পরিণত হইয়াছিল। এখন সেই প্রাচীন কালের বিবাহপদ্ধতি ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। স্ত্রীর পতিনির্ব্বাচনাধিকার এখন আর তাহার হস্তে নাই, সে ভার আসিয়া তাহার পিতামাতা প্রভৃতির হস্তে পড়িয়াছে; সুতরাং নারীগণ পূর্ব্বে যেমন যত বয়সেই হউক না কেন ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারিতেন এখন তাহা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া যে এখন তাঁহাদের একেবারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নহে, এখন তাহাদের বিবাহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তারপর হ্রাস করিয়া আট, নয় এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দ্বাদশ বৎসরে পরিণত হইয়াছিল বশিষ্ঠ, মনু প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রকারগণের সংহিতায় এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু যদিও এই সময়ে এইরূপ শাস্ত্রের বিধান ছিল তথাপি শাস্ত্রবিধি সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত চালিত হইত না। স্ত্রীজাতির বিবাহের বয়স এত কমিয়া যাইবার কারণ বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে যে এ প্রথা সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে এ যুগের বিধি ছিল যে, কন্যার ঋতুকালের তিন বৎসর পরে কন্যা স্বয়ং অভিলষিত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে কিন্তু কন্যা যদি স্বয়ং সৎপাত্র প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন তাঁহার বিবাহ দিবেন; নচেৎ তাঁহাদের ভ্রূণহত্যার পাপস্পর্শ হইবে। কিন্তু সকল সময় নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উত্তম পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ ঠিক নির্দ্দিষ্টকালে হইত না তজ্জন্য তাঁহাদের শাস্ত্রানুসারে মহাপাতক হইত। সেই পাপ হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণের জন্য তাঁহারা ঋতু কালের পূর্ব্ব অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে কিংবা ঠিক দ্বাদশ বৎসরে কন্যার বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, এ সময় বিবাহবিধি বেশ সংস্কৃত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত বিবাহ সম্বন্ধে আর একটা বিধি সংস্কৃত হইয়াছিল; বিধবা বিবাহ যাহা এত কাল সমাজে অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল তাহা এই সময়ে কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন আর যে কোন বিধবার

বিবাহ শাস্ত্র[illegible]ক্ষিতেছিলেন না। তাঁহা[illegible] কেবল মাত্র বালবিধবারই [illegible]খিতে লাগিলেন এবং [illegible] বিধবাগণের বিবাহের নি[illegible]লাগিলেন, সুতরাং এ [illegible] বিধবাবিবাহ কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছি[illegible]ই। তার পর কিছুকাল পরে মনু একেবারে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার মতে বিধবা বিবাহ হওয়া ঠিক নহে, কিন্তু এ বাধা সত্বেও বিধবা বিবাহ একেবারে বন্ধ হয় নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কমিয়া গিয়াছিল। মনুর সময়েও যে বিধবা বিবাহ বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ আমরা মনু হইতেই প্রাপ্ত হই। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫৫, ১৮১, এবং নবম অধ্যায়ে ১৬৯ ১৭৫, ১৭৬ শ্লোকে পুনর্বিবাহিত বিধবার পুত্রের কথা দেখিতে পাই। তদ্ব্যতীত তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬৬ শ্লোকে বিবাহিত বিধবার পতির কথা জানিতে পারি, ইহাই হইল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্কার, ইহা ব্যতীত বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি সংস্কার এই সময়ে সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন অসবর্ণ বিবাহ বিনা বাধায় সম্পন্ন হইত এখন আর তাহা হইতে পাইত না, এখনও অসবর্ণ বিবাহ ছিল তবে পূর্ব্বের ন্যায় ছিল না। এক্ষণে উচ্চজাতির পুরুষ নীচজাতির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ শাস্ত্র বিধান সত্বেও ইহার বিপরীত হইত দেখা যায়। হুয়েনসাংয়ের ভারত বিবরণে আমরা দেখিতে পাই—"When they marry, they rise or fall in position according to their new relationship" ইহা হইতে বুঝা যায় যে যদিও এ সময়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই, কিন্তু তথাপি এরূপ বিবাহ হেতু নীচত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝা যায় যে, শাস্ত্রবিধি এ সময়ে সমাজের উপর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতেই অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ অনেকেই সমাজচ্যুতির ভয়ে আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিত না।

পৌরাণিক যুগ খৃষ্টাব্দ ৫০০ বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ ১১৯৪ বৎসর পর্য্যন্ত।

এই সমুদয় সংস্কার ব্যতীত আর বিশেষ কোন অন্য সংস্কার Epic যুগের পর হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে সাধিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে যাইলে পরবর্ত্তীকালে এই সমুদয় পূর্ব্ব সংস্কৃত বিধির ক্রমোন্নতি ব্যতীত আর কোন নূতন বিধি প্রচলিত হয় নাই। তবে পূর্ব্বে যে বিধবা বিবাহ বর্ত্তমান ছিল দেখিয়াছি তাহা এ সময়ে সহমরণ প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। যদি কোন নূতন বিধির কথা বলিতে হয় তাহা হইলে এই সহমরণ প্রথা উল্লেখ করিতে হয়,

ইহা ছাড়া আ[redacted]না। এরূপ অমানুষিক প্র[redacted]. এ প্রথা এই সময়ে মি[redacted] তাঁহাদের দ্বারাই এখানে [redacted] হইতে বৃহৎ বনস্পতির আবির্ভাব হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঢাকিয়া ফেলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সকল সভ্যজাতির উন্নতির সময়ে তাঁহাদের সমাজে যেমন নারীগণ সম্মানের সহিত অবস্থান করেন, সেইরূপ এই ভারতেরও সভ্যতার দিনে, উন্নতির দিনে নারীজাতিকে এই আর্য্য সন্তানগণ বিশেষ সম্মানের সহিত দেখিতেন। সকল সভ্যজাতির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যেও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হওয়ায় তাঁহারা নিজেরাও যেমন স্বাধীন ভাবে ধরণীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেন সেইরূপ তাঁহাদের রমণীগণকেও স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র যাইতে দিতেন। জ্ঞানালোচনায় তাঁহারা যেমন জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের রমণীগণও সেইরূপ হইয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে, সভ্যজাতির মধ্যে যে সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান থাকে তাঁহাদের মধ্যেও সেই সমুদায় উপাদানের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব।

পৌরাণিক বলেন এই চিরসুন্দর বিরাট রহস্যময় বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহা হইতেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি বা বিকাশ। সেই কল্পান্তের পয়োধিশয়নে যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষ মহাশক্তি কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইলেন, তাহার ফল হইল ব্রহ্মা। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রহস্য বিকাশ করিলেন। সৃষ্টি তাঁহার মহাকাব্য এবং তিনি সেই সৃষ্টিরূপ মহাকাব্যের আদিকবি। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চিরানন্দময় বিশ্বরূপ মহাকাব্যখানিকে আপনার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের চিত্র-ভাণ্ডার হইতে নানাভাবে, নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছেন, তাই সেই সুদক্ষ চিত্রকরের বিচিত্র তুলিকা-কল্পিত, কল্পান্ত-বিকশিত, মণি-খনি-বিভূষিত জগৎ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের বিরাট আদর্শ। তাই ভাবুকনয়নে এই পরিদৃশ্যমান জগতের এত সৌন্দর্য্য, এত লাবণ্য ও এত মাধুরী।

স্রষ্টা তাঁ[illegible]প্রসূত বি[illegible] [illegible] নিখুঁত রূপে সাজাইয়াছেন[illegible] [illegible]ভা, মলয়ের সুস্নিগ্ধ সুরভি, [illegible] [illegible]নে যাহা কিছু সুন্দর বা মধু[illegible] [illegible]তর নূতন বেশ পরাইয়াছেন। শশাঙ্ক অরুণের স্নিগ্ধ-খর-কিরণ-সম্পাতে প্রলয়ের কালান্ধকার ঘুচিয়া গেল, বিহঙ্গের মধুর কুজনে অন্তহীন ফেনিল সমুদ্রের ভীষণ তাণ্ডব কল্লোল দূরীভূত হইল এবং নয়নাভিরাম বিটপী-লতার শ্যামল কান্তি বক্ষে ধারণ করিয়া বসুন্ধরা জীবভোগ্য পরম রমণীয় শান্তি নিকেতন বলিয়া শোভা পাইতে লাগিল। জীবের তখন কি শুভ দিনেরই উদয় হইয়াছিল! আহা! কি শুভক্ষণেই জীব সুন্দরকে চিনিয়াছিল! পৃথিবীতে আসিয়া জীব এই শস্যশ্যামলা, মলয়-মারুত-সেবিতা বিমল-জ্যোৎস্না-বিধৌতা বসুন্ধরাকে কি সুন্দর চোখেই দেখিয়াছিল!

সৌন্দর্য্যজ্ঞান মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহা তাহাকে শিখাইতে হয় না, ইহা আপনা আপনিই তাহার মনে উদয় হয়, ক্ষুদ্র মানব ভাবের ঘোরে পড়িয়া এ তত্ত্ব আপনিই বোঝে, আপনিই শেখে, এবং পরিশেষে সেই ভাব রাশির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া যখন তন্ময় হইয়া যায়, তখন এ তত্ত্ব, এ রহস্য, আপনিই ব্যক্ত করে। সৌন্দর্য্যজ্ঞান মানব আপনিই আপনাকে শেখায়, স্বভাবই তাহার শিক্ষক। ঐ যে ক্ষুদ্র শিশু স্নেহময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নীলাকাশ পটে স্নিগ্ধোজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্র দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং পুষ্পকোরক সুকোমলবৎ আপনার ক্ষুদ্র করদ্বয় বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া রাখিতে চায়, তাহা তাহাকে কে শেখায়? আবার, সে যে প্রকৃতি-অঙ্গে ফুটন্ত কুসুমের রক্ত পীতাদি নানাবর্ণ দর্শনে, কখন বা বিহঙ্গের কমকণ্ঠ শ্রবণে, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, তাহা তাহাকে কে শেখায়? স্বভাবই কি তাহার শিক্ষক নয়? স্বভাবই কি তাহাকে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান দেয় নাই?

সৌন্দর্য্যজ্ঞান মানবের স্বভাবজ ধর্ম্ম হইলেও সকলে কিন্তু সৌন্দর্য্যকে সমান চক্ষে দেখে না। সকলের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যজ্ঞান নিসর্গতঃ বিদ্যমান থাকিলেও সকলে প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থে সমান ভাবে আকৃষ্ট হয় না। কেহবা ক্ষুদ্র তৃণ বা ধূলিকণাটিকেও সৌন্দর্য্যময় বলিয়া ভাবে, আবার কেহবা তাহাকে সামান্য পদার্থ জ্ঞানে দূরে পরিত্যাগ করে। কেহবা চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট থাকাতে চন্দ্রে বা কুসুমে কলঙ্ক বা কীট সম্পর্ক উক্ত পদার্থদ্বয়ের শোভার পরিচায়ক এই জ্ঞানে তাহাদিগকে প্রীতিনেত্রে সন্দর্শন করিয়া থাকে, আবার কেহ

বা উক্ত পদার্থ [illegible] নয়। কেহবা সমুদ্রের ভীষণ [illegible] কেহবা আবার তাহাদিগের [illegible] উপভোগ করিয়া [illegible] বা রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য [illegible] উপলব্ধি করে [illegible] বা বাহ্যলক্ষণ পরিবর্জ্জন [illegible] অন্তরকে সৌন্দর্য্যের [illegible] করিয়া বেড়ায়। কেহবা হাসিতে সৌন্দর্য্য দেখে, আবার কেহবা হয়ত অশ্রুমধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। এইরূপে দেখা যায়, সকল জীব সকল পদার্থে সমান ভাবে আকৃষ্ট নহে। ফলতঃ যে, যে পরিমাণে যে পদার্থের উপর আকৃষ্ট, তাহাতে সে তাবৎ পরিমাণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধ করে।

আবার সৌন্দর্য্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, দেখিবেন যাবতীয় পদার্থ সকলের এই আকর্ষণ শক্তির তারতম্যানুসারে মানব কবি নামে পরিচিত হয়। কবি আর কেহই নহে যিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট তিনিই কবি। আবার সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা কবিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক। কবি প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুরক্তি বা সৌন্দর্য্যাকর্ষণ শক্তিবলে স্বীয় অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা বাহ্যজগৎ হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অনুধাবন বা সংগ্রহ করেন এবং পরিশেষে আপনার কল্পনাবলে সেই অনুচিন্তিত সৌন্দর্য্যতত্ত্বগুলিকে বিশ্বের মঙ্গলার্থ স্বীয় রচনায় প্রকাশিত করেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম উপাদানগুলি কবি দ্বারাই তাহার রচনা বা কাব্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন চন্দ্রকিরণ স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ নগ্ন প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য মানব হৃদয়ে নিসর্গতঃ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কবি এ সৌন্দর্য্যভাবে মগ্ন হইয়া যে আনন্দ পায় তাহা সে একাকী ভোগ করিতে চায় না, সে বাহ্যজগৎকেও তন্ময় করিতে চায়—কাজেই সে লেখনী দ্বারা যতদূর পারে আপন ভাবকে বাহ্যজগতে ব্যক্ত করে। এই লেখনীসম্ভূত ভাবনিচয়ই কাব্য নামে অভিহিত।

আবার কবি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যভাব স্বীয় রচনায় বা কাব্যে ব্যক্ত করিতে গিয়া যে লীলা-চাতুর্য্যের অভিনয় করে তাহাই শিল্প নামে অভিহিত এবং এই লীলা-চাতুর্য্য বা কৌশল বিন্যাসের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি সাধারণতঃ সাহিত্য নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অবশ্য সাহিত্য ও কাব্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। আবার বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সঙ্গীত তো আর কিছুই নহে—ইহা অন্তর্নিবদ্ধ সৌন্দর্য্যভাবের উচ্ছ্বাসময় ঝঙ্কার মাত্র। এইরূপেই ভাবুক চক্ষে সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য, শিল্প বা সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিরূপিত হইয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য[illegible]ভাবে পরিস্ফুট হওয়া একা[illegible] সাহিত্য, কাব্য [illegible] বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে [illegible] সৌন্দর্য্যের উপাদান সংগ্রহ[illegible] আর লেখক বা কবি [illegible] লীলা খেলায় বা শব্দ[illegible] প্রয়োগে বা উচ্ছ্বাসময় ঝঙ্কারে এই অন্তর্জ্জগৎকে বাহ্যজগতে আনয়ন করে, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-উপাসক সাহিত্য বা কাব্যকারের এক দিকে যেমন সৃষ্টি রহস্যের ভূয়োদর্শন আবশ্যক, সেইরূপ অপরদিকে কল্পনাশক্তির উন্মেষ বা বিকাশ আবশ্যক। সাহিত্য বা কাব্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৌন্দর্য্য সাগর হইতে উপাদান সংগ্রহ করে মাত্র, কল্পনাশক্তিই তাহাতে প্রাণ দেয়। কল্পনা-হীন কাব্য কতক গুলি শব্দ ও অলঙ্কারের সমাবেশ মাত্র। এ কাব্যের প্রাণ নাই, কাজেই ইহা নীরস ও ভাবহীন। কল্পনাই কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। ইংরাজ দার্শনিক তাহাই বলিয়াছেন—'Fancy is the breath and finer spirit of literature and poetry.

কিন্তু কল্পনাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্ত্তিত করা চাই। এবং যতই স্বাভাবিক ভাবে ইহার প্রবর্ত্তন বা পরিচালনা হয়, ততই কাব্য মধুর বা আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক ভাবে কল্পনার উন্মেষ হইলে কাব্যে প্রাণ থাকে না, কাজেই তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়। কল্পনা যতই স্বাভাবিক ভাবে, স্বাভাবিক নিয়মে লেখকের প্রাণে উদিত হয়, ততই তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ততই তিনি হাসিয়া কাঁদিয়া, কখন বা প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া, আপনার অন্তর্নিহিত আনন্দ-ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত প্রেম ও আনন্দের বহির্বিকাশ মাত্র। কাজেই লেখক স্বাভাবিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া যাহা লিখেন তাহাই সুন্দর, তাহাই মধুর হয়।

এক্ষণে সুন্দর কি ইহাই বিবেচ্য। প্রসিদ্ধ রোমীয় দার্শনিক Murcus Aurilius বলিয়াছেন,—"নৈসর্গিক বস্তুর যাহা কিছু নৈসর্গিক ভাবে ঘটে তাহাই সুন্দর ও আনন্দপ্রদ"। সুপক্কাবস্থায় ফলটী যখন বৃন্তচ্যুত হয়, ধান্যশীর্ষ যখন বায়ুভরে হেলিয়া পড়ে, সিংহ যখন ভ্রুকুটী করে, ভল্লুক যখন ক্রোধে ফেন উদ্গার করে, তখন দর্শকের চক্ষে এ সমস্ত দৃশ্য প্রথমতঃ সুন্দরের বিপরীত বা অসুন্দর বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু প্রকৃত ভাবুক যখন উহাদিগকে মার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিয়া উহাদিগকে প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য মনে করেন, তখন উহাদিগের মত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে? এইরূপে মার্জ্জিত

নয়নে দেখি[illegible]কলাভিষিক্ত চন্দ্রলেখার ম[illegible] করা যায়। অবশ্য এ সৌ[illegible] ভাগ্যে ঘটে না। কেবল যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির অশ্রান্ত সঙ্গী[illegible] মিলাইয়া তন্ময় হইয়া যায় [illegible] এ সৌন্দর্য্য অনুভব করে। আমি সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবনে তাহাদের হৃদয়ে যে এক অপরিসীম, আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয়, তাহাতে তাহারা আজীবন মগ্ন থাকে। A thing in beauty is a joy for ever.

প্রকৃত ভাবুকের চোখে জগৎ সুষমা-বিশিষ্ট একটী সুন্দর গঠন এবং একটী শৃঙ্খলার রাজ্য। দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, বর্ষ, যুগ যাহা কিছু শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্যের সহিত সম্পাদিত হয় তাহাই প্রকৃত সুন্দর। পক্ষান্তরে যে সমস্ত পদার্থে বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ দৃষ্ট হয় অথবা তাহাদের এই বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ যাবৎ সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলায় পরিণত না হয়, তাবৎ তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোথায়? তাই বুঝি প্রকৃত ভাবুক প্রকৃতির সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব পদার্থে সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া থাকেন। তুমি আমি যখন জগন্মণ্ডলব্যাপ্ত নিবিড় অন্ধকারের দৈত্য-লীলা দর্শনে, ঘোরা রজনীর নিবিড় জলদমালার তাণ্ডব অভিনয়ে, নিস্তব্ধ, নীরব গম্ভীর জগতের বিভীষিকাময় অবসাদ দর্শনে প্রলয় গণনা করিয়া শঙ্কিত-চিত্তে অবস্থান করিব, তখন প্রকৃত ভাবুক—প্রকৃত সৌন্দর্য্য-উপাসক সেই প্রকৃতির তামসী লীলার মধ্যেও এক অনিন্দ্য অব্যক্ত মাধুর্য্য দর্শন করিবেন। তিনি চিত্রময়ী বসুন্ধরার সেই উন্মত্ত বেশ দর্শনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রাণ হইবেন তাহা তিনি ছাড়া আর কে অনুভব করিতে পারে? তিনিই যথার্থ প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। তোমার আমার কাছে বায়ু বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বসিত সিন্ধুর ভীষণ গর্জ্জন, দৈত্য দানবের বিকট হুহুঙ্কারের মত বিভীষিকাময়, কিন্তু ভাবুকের কাছে সে গর্জ্জন বৃন্দাবন নিকুঞ্জে শ্যাম-কণ্ঠোদগত বাঁশরী ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নহে। সে ধ্বনি অতি মধুর, অতি সুন্দর! তার স্তরে স্তরে, প্রতি মূর্চ্ছনায়, যেন কি এক অপূর্ব্ব অমৃতনিস্যন্দ ক্ষরণ করে। তুমি আমি কেবল চন্দ্রের স্নিগ্ধ কৌমুদীতে, মলয়ের সুরভি সমীরে, বসন্ত-লতার বিকসিত ফুলে, এবং কোকিল ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কারেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিব। কিন্তু ভাবুকের হৃদয় তা নয়। তিনি সুখে দুখে, আলোকে বা অন্ধকারে, এইরূপে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সমান সৌন্দর্য্য অনুভব করিবেন। তুমি কেবল হাসিতেই স্বর্গের সুষমা দেখিতে পাও প্রকৃত ভাবুক অশ্রুবিন্দুতেও মুক্তার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া আনন্দ

পাইয়া থাকে[illegible] সৌ[illegible] সৌন্দর্য্যতেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য জ্ঞান[illegible] ভাবুক [illegible]পাসক—তাঁহার কৌতূহল—কেবল বহির্বিশ্বে নিবদ্ধ থাকে না, তিনি অন্ত[illegible]সে বহিরন্ত উভয় স্থলই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তিনি বিরাট [illegible] স্বপ্নবখানি, সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুর অভ্যন্তরে নিহিত করেন, [illegible] ধ্যানমগ্ন ভাবভক্ত ও বিশ্ব-প্রেমিক। তাঁহাব নিকট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেব প্রত্যেক তৃণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, প্রত্যেক তরুলতা, প্রত্যেক কীটপতঙ্গ বা পর্ব্বত প্রান্তর দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ। স্বপ্নদৃষ্ট জগতের কুহেলিকান্তরালে তিনি এক রমণীয় অভিনব তত্ত্ব দেখেন এবং সেই অভিনবত্বেব মর্ম্মস্থলে বিশ্বেব বিবাট সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেন। সেই সৌন্দর্য্যে প্রেমিকের হৃদয় যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, তখন তিনি সৃষ্টির স্তরে স্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি প্রকৃত কবি ও রসজ্ঞ পুরুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাবে বিভোর হইয়া তিনি যেন স্বপ্নলব্ধ কোন এক সুখময় বৈজয়ন্তধামের সুনীলাকাশে পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মত, আপনার কল্পনাপক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ান, কেহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন কেবল উন্মুক্ত, অনন্ত, শ্যামলা প্রকৃতি যেন কোন সুপ্তোত্থিতা মুক্তকেশীর ন্যায় অলস অঙ্গযষ্টি প্রসারিত করিয়া দিক্‌দিগন্তকে শ্যামায়মান করিয়া বসিয়াছে। আরও উর্দ্ধে—কখন বা সে মলয় উচ্ছ্বাসের ন্যায় কুসুম সৌরভ সাষ্টাঙ্গে মাখিয়া কোন এক শান্তিপূর্ণ নন্দন বনে মন্দাকিনীর ধারায় বহিয়া যায়, কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তারপর—আরো উর্দ্ধে উষালোকবিচ্ছিন্ন নীলিমায় পূর্ণ কলাভিষিক্ত চন্দ্রকলার মত যে অপূর্ব্ব মধুর অনধিগম্য মহিমা চিত্রিত আছে সেই প্রাণস্পর্শী মহিমার ছবি ধ্যানস্তিমিত নয়নে বার বার দেখিতে থাকে। ক্রমে তাহার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়—সে লুপ্তসংজ্ঞ অবস্থায় শুনিতে পায়—দূরে বায়ুর স্তর ভেদ করিয়া সপ্ততারসমুত্থিত ঐক্যতানের মত কোথা হইতে এক মধুর সঙ্গীত উদ্গত হইতেছে, আবার দিগন্ত প্রসারিত মহাশূন্যে মাধুরী ঢালিয়া কোথায় সে মিশিয়া যাইতেছে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব বুঝি প্রলয় সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসের মত, বেদ বেদাঙ্গের প্রতিধ্বনির মত, সেই মহা সঙ্গীতের এক একটী মূর্চ্ছনা হইতে উদ্ভূত। তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই যথার্থ উপাসক, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মবাদী। তিনি আপনার সাধনা বলে, আপনার পুণ্যবলে, জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে, আলোক অন্ধকারে, সেই বিধাতার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অভাব আছে ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জীবের মায়া।

এই দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগের পরস্পরে যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, একের সাহায্যে অন্যটি পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং একটি ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে অপর গুলির ক্রিয়া কলাপের বাধা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ মায়া, দয়া, ধর্ম্ম ইহারা ভিন্ন ভাব ধারণ করিলেও ইহাদিগের পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। মায়া কাহাকে বলে? কোথা হইতে মায়ার উৎপত্তি? বিশ্ববিমোহিনী ঐশিক শক্তির ভিন্ন নাম মায়া। জগৎপাতা মায়াবলে জগতের সৃষ্টিপালন এবং সংহার কার্য্যাদি স্বেচ্ছানুযায়ী প্রতি নিয়ত সম্পাদনা করিতেছেন। মায়ার প্রভাব অচিন্তনীয়, মায়ার দ্বারা জীবগণ এই লীলাময়ী সংসার কাননে বিচরণ করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় একটী শ্লোক আছে—

সারা এতস্য সংদষ্টুঃ শক্তি সদা সদাত্মিকা মায়া নাম মহাভাগ।

অর্থাৎ মায়া নিত্যা নিত্য স্বরূপা সাংখ্য রূপে প্রকৃতি দশা পুরুষ (মহাবাহু) বিষ্ণুর শক্তি।

মায়ার ক্রিয়াকলাপ নানাপ্রকার। কোন কোন স্থলে মায়া কর্ত্তৃক মনে ভূমানন্দের উদ্রেক হয়। এবং তাহাতে সুখশান্তি প্রদান করে। আবার কোন কোন স্থলে সেই মায়ার দ্বারা নিরুদ্যম কলহ এবং অশান্তির উদ্ভব হওয়ায় নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। বিশ্ববিমোহিনী মায়া অতি বলিয়সী। সুতরাং এই মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হয় না এরূপ ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল। আমরা সংসার ধর্ম্মী. এই জটিল সংসারগারদে মায়াশৃঙ্খলাবস্থায় আবদ্ধ ভাবে রহিয়াছি। শুধু আমরাই বা কেন? আমাদের গৃহপালিত জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদয় সংসারের মায়া পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা যদি কোন প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি বা দর্শন লাভ করি তাহাতে হৃদয়ে যে এক প্রকার স্নেহ রসের আবির্ভাব হয় তাহারই নাম মায়া। কোন প্রাণীকে বিপদাপন্ন দেখিলে তৎকালে হৃদয়ে যে বেদনা অনুভূত হয়, তাহাকে মায়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কোন বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইলে মনে যে একপ্রকার আনন্দ অনুভব করা যায়, তাহাকেও মায়া বলিতে হইবে। যদ্যপি এ সকল হিতকার্য্যের বৈকল্য ঘটে, তাহা হইলেও মনে যে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার উদয় হয়, তাহাকেও মায়া ব্যতীত আর কি বলিতে পারা যায়? অতএব স্পষ্টই অনুভব করা যাইতেছে যে মায়াতে চিত্তের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া মনুষ্যকে অচেতন প্রায় করিয়া ফেলে, অর্থাৎ মায়া কর্ত্তৃক দুই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দয়া, মায়া এবং ধর্ম্ম ইহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হেতু মায়ার উদ্ভব হইলে দয়ার উদ্রেক হয়। এবং দয়ার সঞ্চার হইলে ধর্ম্ম স্বাভাবিক উপস্থিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মোপার্জ্জ [illegible] ভর দ্বারা দয়াতে বিবিধ সদনু [illegible] হলে অগ্রে মায়া, ও দয়ার অ [illegible] তে সন্দেহ নাই। এইজন্য [illegible] না করিয়াছেন। যখন মায়া ব্যতীত [illegible] ও ধর্ম্ম হইতে পারে না, তখন মানব দেহে মায়া থাকা কত-দূর প্রয়োজন, সাধু মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বস্তুতঃ অনেক স্থলে মায়া কর্ত্তৃক বিবিধ অহিত সাধন হয়; ইহা অনুমেয়—যথার্থ। পরন্তু সে স্থলে একটু চিন্তাশীল ও সংযমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে মৈথিলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ মৃগরূপ মায়াবী মারিচের আক্রমণ হেতু তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন, এদিকে কর্ব্বুরোত্তম দশানন মায়াবলে ভিক্ষুকের বেশে জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন।

যদি তাঁহাদের মায়াশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে সে স্থলে মারিচ কিরূপে উক্ত বেশ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা রক্ষোরাজ জানকীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া শেষে সবংশে নিবংশ হইয়াছিলেন? ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি লৌকিক সকলই ঐশিক শক্তি মায়া-পরিকল্পিত। দয়া, মায়া মনুষ্য শরীরে বিরাজ করে, নির্দ্দয় পাষণ্ডের হৃদয়ে নয়। সুতরাং এ মায়া, দয়া থাকা 'মনুষ্য' নামের প্রধান পরিচায়ক। মায়া এবং কাম, ক্রোধ রিপুগণের দ্বারা অনেক সময়ে অনিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণে ধর্ম্মপরায়ণ পর-মাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী নীতি শাস্ত্রকারগণ প্রাগুক্ত রিপুদ্বয়ের বশীভূতার্থে নানারূপ আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক কালে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করেন নাই; কারণ রিপু চৈতন্য না থাকিলে কায়িক ও মানসিক কোন কার্য্যই সুক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয় না। রিপুগণের শুভাশুভ কার্য্য বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, হিতাহিত জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানটুকু মানব-দেহে অতি স্বল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। হিতাহিত জ্ঞান মনুষ্যের ব্যতীত অন্য কোন জীবের নাই। সেই জন্যই মনুষ্যগণ জীব জন্তুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া থাকে। এই জ্ঞান না থাকিলে ভালমন্দ বিচার কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। যাঁহার যে পরিমাণে জ্ঞান আছে, তিনি সেই পরিমাণে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। সৎ, অসৎ কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞানের দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সংসারে বিপদগ্রস্থ হইতে হয় না। এই দুরতি-ক্রমণীয় ঐশিক শক্তি মায়ার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মনের উৎকর্ষ সাধক জ্ঞান কথনই মানব হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। মায়াই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের প্রবর্ত্তিকা। পরমেশ্বর সেইরূপ পরমাত্মাতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য জীবগণ মায়া সম্ভূত সত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাধারে অনুরক্ত হইয়া সুখ দুঃখের অংশী হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসত্যসাধন চেল।

শী ন র তৈল।



...তৈলের রাণী—সুষমা, সৌরভ ও আনন্দে পরিপূর্ণ! মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও শক্তিশালী করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ! ইহা কেশরোগ দূর করে, শিরঃপীড়া নাশ করে, আর ঘন কৃষ্ণ মসৃণ কেশগুচ্ছে মস্তক শোভাময় করিয়া তুলে। যদি পুষ্পের মিষ্ট স্নিগ্ধ মনোরম গন্ধে গৃহ আমোদিত ও প্রাণ পুলকিত করিতে ইচ্ছা করেন, শীতল সাগর ব্যবহার করুন। ইহা গবেষণার সহায়,—ছাত্রের সুহৃদ, প্রিয়জনের মনোরঞ্জন।

প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

ইস্তাম্বুলের খাঁটি

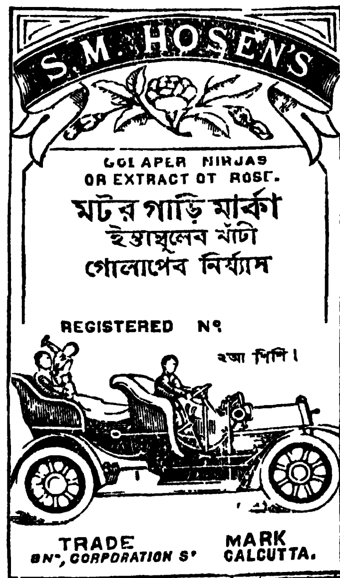
গোলাপের নির্য্যাস।

মটর গাড়ী মার্কা গোলাপের নির্য্যাস ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক শীতল ও মন-প্রাণ প্রফুল্ল হয়। আমরা ইস্তাম্বুলের খাঁটি গোলাপ চুয়াইয়া এই আরক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা চক্ষু ও শিরোরোগে পরম উপকারী। মুল্য প্রতি শিশি ।০ আনা মাত্র।

মহাসুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল। পাইন্ট ৸০; ডজন ৭৲ টাকা।

এস, এম, হোসেন।

৮ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



[illegible] ঔষধালয়।

আমরা বিজ্ঞাপনে [illegible] আড়ম্বর করিতে চাহি না, কেবল [illegible]বিখ্যাত কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদিক [illegible] ঔষধ লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

"শঙ্কর [illegible]"। [illegible] দোষ জনিত শরীরে চুলকণা, চাকা চাকা দাগ, দুষ্ট রক্ত, পায়ে [illegible] হাতের তালায় কাল কাল দাগ, ছাল উঠা, খুজলি ও শরীরের ক্ষত, এরূপ ঘৃণিত [illegible] রোগ [illegible] নির্দ্দোষ আরাম হইয়া থাকে। আরোগ্য না হইলে মূল্য [illegible]। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ দেড় টাকা। মাশুলাদি ।৶০ আনা।

"চ্যবন প্রা[illegible]"। সর্দ্দি, কাশি, যক্ষ্মা, বুক বেদনা, হাঁপানি প্রভৃতি যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। সাধারণের সুলভের জন্য প্রতি সের ৩৲ টাকা।

"কামদেব বটী"। ইহা শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগের আশুফলপ্রদ মহৌষধ। পরীক্ষার্থে এক বটী /০ আনা (২০ বটী) এক কৌটা ১৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"মদনানন্দ মোদক"। বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভের আয়ুর্ব্বেদোক্ত অমোঘ মহৌষধ। ইহাতে শুক্রতারল্য ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফল করিয়া থাকে। মূল্য সের ৬৲ টাকা।

"শান্তি-সুধা"। ইহা সেবনে ঘোলাটে সপূঁজ, শুক্র ও রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র, শুক্রমেহ (গণোরিয়া) প্রভৃতি রোগের আশুফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"অমৃতসার-কষায়"। কুষ্ঠ, বাতরক্ত, চুলকণা, রক্তদুষ্টি, গর্ম্মি ও পারদ-জনিত ক্ষত, হাতে পায়ে কালো দাগ, গেঁটে বাত, গ্রন্থি স্ফীতি প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগ সমূলে নষ্ট হইয়া রক্ত পরিষ্কার করে এবং শরীরকে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিতে এমন ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। ডজন ১০৲ টাকা।

চিঠি পত্রাদি ৬০ নং রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট, ম্যানেজার গোপীকান্ত ঔষধালয় অথবা ২৭ নং বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিবেন।

কবিরাজ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কবিভূষণ।



…গম বাহার।

… ও নবাবদিগের ভোগ-বিলা… …ক না জানেন ? আতরের আ… …ন বেগম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপস… বেগম ও বাদসাহদিগের যাহা প্রাণা… ও সোহাগের ডালি ছিল এই সে… …হারের অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব গন্ধে অ… বিভোর হউন। ইহা একাধারে আপনা… …, সুখ, বিলাস, সৌন্দর্য্য, চিরযৌবন… স্বাস্থ্য প্রদান করিবে।

সুদূর … …র হইতে ও পৃথিবীর নানা দিক্‌দেশ হই… …গম বাহারের বহু অর্ডার নিত্য আসিতেছে। এ বৎসর "তারার মালা" নামক একখানি সুখপাঠ্য বৃহৎ উপন্যাস মনোমুগ্ধকর বহু হাফটোন চিত্র সহ প্রকাশিত হইয়াছে বেগম বাহারের প্রত্যেক ক্রেতাকেই উপহার দেওয়া হইতেছে। উক্ত পুস্তক অল্পই ছাপা হইয়াছে, গ্রাহকগণ সত্বর হউন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি।৴০, ডজন ১০৷৷ টাকা, মাশুলাদি ১৷০ পাঁচ সিকা।

মোমসেক বটিকা।

পুরাকালের বাদসাহ ও নবাবগণ শত শত বেগম রাখিতেন তথাপি তাঁহারা চিরযৌবন সম্পন্ন থাকিতেন কিরূপে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে। এই মোমসেক বটিকা ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আবিষ্কার একটী বটিকা একবার মাত্র ব্যবহারেই আপনি মুগ্ধ হইবেন। এই অধিকারোক্ত রমণী রঞ্জন তেলা, প্রেম রঞ্জন তেলা, এবং আশ্চর্য্য খদিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় প্রত্যেক যুবক যুবতীই স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।



মূল্য প্রতিসেট উক্ত চারি প্রকার ঔষধ একত্রে ২৷৹ ফাষ্টকোয়ালিটী বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত এক সেট ৫৷৹ আনা মাশুলাদি।৴০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ইউনানী মেডিক্যাল হল

১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ করিবার ঠিকানা—"বেগমবাহার" কলিকাতা।

৫।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মাণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত ও
২৩।১ নং শঙ্কর হালদারের লেন হইতে শ্রীভবতারণ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

Registered No. C. 658.

১ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। [৫ম সংখ্যা।

December, 1912.

অতিথি

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক { শ্রীসত্যসাধন চেল ও শ্রীভবতারণ দাস।

২৩।১ নং শঙ্কর হালদারের লেন, আহিরীটোলা, (বিডন স্কোয়ার পোঃ আঃ)

"অতিথি" কার্য্যালয় হইতে শ্রীভবতারণ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [নগদ মূল্য ৵০ আনা।

সূচী।



বেগম বাহার।

বাদসা-বেগম ও নবাবদিগের ভোগ-বিলাসের কথা কে না জানেন? আতরের আবিষ্কর্ত্রী নুরজাহান বেগম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী সেই সব বেগম ও বাদসাহদিগের যাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও সোহাগের ডালি ছিল এই সেই বেগমবাহারের অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব গন্ধে আপনিও বিভোর হউন। ইহা একাধারে আপনার আনন্দ, সুখ, বিলাস, সৌন্দর্য্য, চিরযৌবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রদান করিবে।

সুদূর সাগর পার হইতে ও পৃথিবীর নান দিক্‌দেশ হইতে বেগম বাহারের বহু অর্ডার নিত্য আসিতেছে। এ বৎসর "তারার মালা নামক একখানি সুখপাঠ্য বৃহৎ উপন্যাস" মনোমুগ্ধকর বহু হাফটোন চিত্র সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বেগম বাহারের প্রত্যেক ক্রেতাকেই উপহার দেওয়া হইতেছে। উক্ত পুস্তক অল্পই ছাপা হইয়াছে, গ্রাহকগণ সত্বর হউন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।/০, ডজন ১০॥ টাকা, মাশুলাদি ১৷০ পাঁচ সিকা।

মোমসেক বটিকা।



পুরাকালের বাদসাহ ও নবাবগণ শত শত বেগম রাখিতেন তথাপি তাঁহারা চিরযৌবন সম্পন্ন থাকিতেন কিরূপে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে। এই মোমসেক বটিকা ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আবিষ্কার একটী বটিকা একবার মাত্র ব্যবহারেই আপনি মুগ্ধ হইবেন। এই অধিকারোক্ত রমণী রঞ্জন তেলা, প্রেম রঞ্জন তেলা, এবং আশ্চর্য্য খদিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় প্রত্যেক যুবক যুবতীই স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

মূল্য প্রতিসেট উক্ত চারি প্রকার ঔষধ একত্রে ২৸০ ফাষ্টকোয়ালিটী বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত এক সেট ৫৸০ আনা মাশুলাদি ।/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ইউনানী মেডিক্যাল হল

১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা

টেলিগ্রাফ করিবার ঠিকানা—"বেগমবাহার" কলিকাতা।

অতিথি, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি" ॥

দেশানুরাগী সুরেন্দ্রনাথ।

তিনটী যুবক কলিকাতা হইতে কর্ম্মভূমি কলির অমরাবতী ইংলণ্ড রাজ্যে শিক্ষার জন্য গমন করেন, দুইজন নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আইসেন, একজনের প্রথমে বয়স লইয়া গোলযোগ, তাহা কোনরূপে মিটিয়া গেলে তিনি বাঙ্গালি সাহেবরূপে বঙ্গভূমে সিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি আমাদের সুরেন্দ্র নাথ। খ্যাতনামা তেজস্বী চিকিৎসক ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই একটু ইউরোপীয় রীতিনীতির অনুরাগী। আমরা তাঁহার বি,এ পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাই,লিখিত আছে S.N.Banerjee St. Zavier College. ইহাতেই সাহেবীআনার পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৈশব চরিত্রের আর একটী কথা আমরা শুনিতে পাই, অতিশয় মানব হৃদয় পারদর্শী সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভান্বিত পিতা নাকি বলিয়াছিলেন—I see the parts of Cecero in you. যাহা হউক,সুরেন্দ্র একটী পরম সুন্দর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বাঙ্গালী সাহেব রূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে সিবিলসার্ভিসে প্রবেশ করিলেন।

তখনকার সিবিলিয়ানগণ কখনও মনে করেন নাই, যে বাঙ্গালীরা সহস্র পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হইলেও তাহাদের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইবে। তাই সুরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধ সিভিলিয়ান Sutherland সহিত মিলিল না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল ঘটনা লিখিব না, কিন্তু আমার যখন কলেজে প্রথম বর্ষ, তখন হিন্দু পেট্রিয়টে প্রায় ৬ মাস Mr. Surendranath Banerjee's Case বলিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইতেছিল। রসিক সম্পাদক শিশির বাবু লিখিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের নানা দোষ।

১। সুরেন্দ্র বাঙ্গালী হইয়া অতিশয় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহাকে Purgery Section এ দেওয়া যাইতে পারে।

২। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হইয়া সাহেব সাজিয়াছেন, সুতরাং he has forged an Englishman ইত্যাদি।

অতি সামান্য কারণে সুরেন্দ্রনাথের চাকরী গিয়াছিল, তাহা ইংরাজেরা স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ বলেন, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভান্বিত কর্ম্মচারীকে দূর করিয়া গবর্ণমেণ্ট অতি অন্যায় ও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতমাতা সুরেন্দ্রনাথের সেবা চাহিতেছেন, কে তাহা নিবারণ করিবে? সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের রাজসেবা অচিরে শেষ হইল। আজি সুরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বাঙ্গালী যতই শিক্ষিত ও সভ্য হউন না,

শূরোসি কৃতবিদ্যোসি, পণ্ডিতোসি রে পুত্রকঃ।
যস্মিনকুলে ত্বমুৎপন্ন গজস্তু এ নহন্যতে।

তাই সুরেন্দ্রনাথের নবীন যৌবন ইউরোপীয় রীতিনীতি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইল এবং কি করিলে মাতৃভূমি ও স্বদেশী ভ্রাতৃগণের এই অযোগ্যতা দূর হইতে পারে, এই বিষয়ে তাঁহার সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন।

সমস্ত বঙ্গদেশ কি ভারতবর্ষ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই অবিচারে মর্ম্মাহত হইল। বঙ্গের কৃতিসন্তানগণ, কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য নেতাগণ সুরেন্দ্রনাথের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জনের দ্বারাই ক্ষান্ত হইলেন না। কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাকে হিন্দুপেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক করিতে চাহিলেন, কিন্তু ভারতীয় সংবাদ পত্রের এমন সচ্ছল অবস্থা ছিল না, যে সুরেন্দ্রনাথের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন। তখন সহসা বিদ্যাসাগর তাঁহাকে মেট্রোপলিটান কলেজের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন।

শিক্ষকরূপে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে দেখা দিলেন, কিন্তু ভারত-জননী তাঁহার সামান্য বালকগণের শিক্ষায়ই পরিতৃপ্ত হইলেন না, তাই সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত লোক শিক্ষকরূপে আহ্বান করিলেন।

আমার যখন তৃতীয় বর্ষ কি দ্বিতীয় বর্ষ ঠিক নাই, তখন হিন্দুস্কুল থিয়েটারে মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ Rise and Progress of the Sheikhs বিষয়ে জলন্ত বক্তৃতা করিলেন, আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, ইনি কে? কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার বক্তৃশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা কেহ নহেন, অথচ এই জলন্ত বক্তৃতা কে প্রদান করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরম সুন্দর রূপ মাধুরী, সাহেবীআনা ত্যাগী সাহেবী ভাব ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া

গেলাম, এ লোকটী কে? আমাদের অগ্রজ বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ বলিলেন, ইনি সুরেন্দ্রনাথ বেনার্জ্জি। আমার তখন মনে হইল, কলেজের প্রথম বর্ষে যে পড়িয়াছিলাম, Surendra nath Banerjees case, এ তিনি। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ। দেখিলাম, ভারতগগনে এক মহা শক্তি আবিভূর্ত হইতেছে।

ক্রমে মহাত্মা আনন্দমোহন বসু আসিলেন, যে র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষায় এপর্য্যন্ত বাঙ্গালী উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই পরীক্ষায় তিনি আশ্চর্য্যরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। লোকমুখে শুনিয়াছি,তিনি আগে জানিতে পারেন নাই,পরে কয়েক সপ্তাহ পড়িয়া সেই কঠোর পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্র দুই মহাশক্তিরূপে কলিকাতায় উদিত হইলেন। তাঁহাদের প্রথম কার্য্য Students' Association. আজি যে আমরা অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, এ, চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে নেতৃ স্থানে অবলোকন করি, তাঁহারাই সেই ছাত্রসভার দল, সুরেন্দ্রনাথ তথায় ইংরাজ জাতির মহত্ব, যেসকল মহত্বগুণে ইংরাজ জগতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সে সকল তিনি সমুৎসুক ছাত্রবৃন্দের নিকট বিবৃত করিতেন, এবং আমাদের যে সকল অভাব, যে দুর্গতি, তাহা তেজোময় অগ্নিময় বাক্যে বিবৃত করিয়া ছাত্রগণ মধ্যে, একটা সাধারণ মত গঠন করিলেন। তখন সকলেই ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর উদাহরণ অনুসরণ করিত, তখন দেশে একটী জীবন্ত ভাবের স্ফূরণ হইয়া উঠিল। ছাত্রসভা তাহার কার্য্য দৃঢ়ভাবে করিতে লাগিল।

যে সমস্ত মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রসভা হইতে বাহির হইলেন, তাঁহারাই Indian Association বা ভারতসভা গঠন করিলেন। প্রথম যেদিন ভারত-সভার অধিবেশন হইল, সেই সভার কথা কখনও ভুলিব না। কালীচরণের অগ্নিময় বক্তৃতা, সুরেন্দ্রনাথের উত্তর, এ সকল কখনও ভুলিবার নহে। ক্রমে ভারতসভা মহাশক্তিরূপে কার্য্য করিতে করিতে কংগ্রেস মহাসাগরে প্রবেশ করিল। ১৮৭৪ সালে ছাত্রসভা, ১৮৭৮ সালে ভারতসভা ও ১৮৮৪ প্রথম বোম্বে কংগ্রেস, তাহাতে বঙ্গের কেবল W. C. Banerjee, নরেন্দ্রনাথ সেন রায়-বাহাদুর ও সুরেন্দ্রনাথ ও বোধ হয় মনোমোহন ঘোষ ছিলেন। এই নূতন আলোক লইয়া উক্ত মহাত্মাগণ, মহামান্য দাদাভাই নরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেস মহাসভা স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে দেশবিদেশের মহাপুরুষগণ

একত্রিত হইলেন। বঙ্গের নেতা সুরেন্দ্রনাথ, বোম্বের মেটা, মান্দ্রাজের আনন্দ-চার্লু, এলাহাবাদের অযোধ্যা নাথ ও মদনমোহন, আলিমহম্মদ ভীমজী, প্রভৃতি দেশে দেশে মহাপুরুষগণ মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গে নূতন নূতন মহাপুরুষ গাত্রোত্থান করিলেন, কয়েকটী নাম করিয়া রাখি, কারণ আর সময় নাও পাইতে পারি।

W. C. Banerjee	অশ্বিনীকুমার দত্ত
মনোমোহন ঘোষ	অনাথবন্ধু গুহ
আনন্দমোহন বসু	আনন্দচন্দ্র রায়
লালমোহন ঘোষ	ঈশ্বরচন্দ্র দাস
নরেন্দ্রনাথ সেন	বিষ্ণুপদ লাহিড়ী
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	প্রসন্নকুমার বসু
কৈলাসচন্দ্র সেন	মতিলাল ঘোষ
অম্বিকাচরণ মজুমদার	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিপিনচন্দ্র পাল

যাত্রামোহন সেন *

আরও অনেক নাম উল্লেখ করিতে পারিতাম, ইহাঁরা মাতৃপূজায় জীবনোৎসর্গ করিলেন। বঙ্গের রাজনৈতিক গগন অসংখ্য তারকায় শোভমান হইল, বঙ্গ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র দেহ মন যেন এই কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত করিলেন। মহাশক্তিরূপে কংগ্রেস ভারতগগনে সমুদিত হইল, এবং ধীরে ধীরে অনেকগুলি অধিকার দেশে প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই ভাবে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করিতে লাগিল।

প্রথমবারের কলিকাতা কংগ্রেসে আমার যাওয়া হয় নাই, আমার ভ্রাতা শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ তখন কলিকাতায়। তিনি বলিলেন, প্যারীদা, তোমার মত লোকের কংগ্রেসে না যাওয়া বড় অন্যায়, তাই আমি প্রথম এলাহাবাদ কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে যাত্রা করিলাম। সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাত্রীগণ আমাদের গাড়ীর দুই কম্পার্টমেণ্টে ছিলেন, সুরেন্দ্র আমাকে ধরিলেন, বগুড়ার কেহ কংগ্রেসে আসেন না কেন, আমি আপনাকেই বগুড়ার জন্য দায়ী

* এস্থলে বলা বাহুল্য, মাননীয় লেখক মহাশয় উক্ত দলের একজন পক্ষপাতী ছিলেন। যেহেতু তিনি বিনয় ও লজ্জাবশতঃ নিজের নামোল্লেখ করিলেন না।—অঃ সঃ।

করিলাম। ইতিপূর্ব্বে একবার সুরেন্দ্রনাথ বগুড়া Local self govt সভা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ও তৎপূর্ব্বেও ত্রিগুণাবাবুর সহিত আমি সুরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ গাড়িতে বসিয়া কি প্রকারে Legislative Councilএ আমাদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রথমে নরেন্দ্রনাথের সহিত মতভেদ হয়, পরে, তিনি বলিলেন, you are right, Mr. Banerjee নরেন্দ্রনাথের উদারতায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। চতুর্থ এলাহাবাদ কংগ্রেসে বিলাত হইতে Mr. Caine আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, সুরেন্দ্রনাথের কি শক্তি, What a tremendous voice the man has got, a whole province is under his control. যখন রাজা শিবপ্রসাদ সভায় আসিলেন, শিবপ্রসাদ দেশদ্রোহী, কংগ্রেসের বিপক্ষ, তিনি কংগ্রেসের বিপক্ষে বলিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণকে বলিলেন, আপনারা কেহ শিবপ্রসাদকে hiss করিবেন না। সমস্ত কংগ্রেস মণ্ডপ শিবপ্রসাদকে উপহাস করিল, বাঙ্গালি প্রতিনিধিগণ নীরব। এইরূপ কোন কোন ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় কেন্ সাহেবের উক্ত ধারণা হইয়াছিল।

কংগ্রেস সভা ক্রমে তাহার অল্পদিন সৌন্দর্য্য শোভিত হইল, ইহাকে Feroze Shah Mehta বলিলেন Non official Parliament এবং ইহাই ভারতের মহাশক্তি ও ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্ট হইবে, বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। আমরা তাহার পরে অনেক উল্কাপাৎ, অনেক ভূকম্পন প্রভৃতি কংগ্রেস মঞ্চে দেখিলাম, কেহ কেহ বলেন, সে কংগ্রেস আর নাই। কিন্তু যাহা হউক, ইহা হৃদয়ে এমন অপরিহার্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যে এই কংগ্রেস যে কোন দিন বিনষ্ট হইবে, একথা অসম্ভব। আমার ভবিষ্যদ্বাণী যুবকগণ শেষ জীবনে বুঝিতে পারিবেন। কংগ্রেসের সূত্র মধ্যে একটী লোকের কথা আমি বলিব।

একজন কৃতবিদ্য বারিষ্টার কোন সুযোগে উচ্চ বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি কোন দিন দেশসেবক নহেন। সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সকলকে লইয়া এক মহান জাতি গঠনে প্রস্তুত। বাস্তবিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তেমন প্রেম কোথাও দেখি নাই, তাঁহার বন্ধু আবুল কাশিম প্রমুখ মুসলমানগণের প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ। কিন্তু হায় একজন অন্তরালে বসিয়া গুণ টানিতেছিলেন, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়া দিলেন, তোমরা সভা করিও না, কিন্তু গোপনে ষড়যন্ত্র কর। আমরা প্রকাশ্যে

সভা করিলাম, শুনিলাম সহরের এক কোণে এক গোপন সভা হইয়াছে, তাহার টেলিগ্রাম কাগজ পত্রে বাহির হইয়াছে। এই নেতা স্বজাতীয়দিগকে লইয়া এক পৃথক জানালা কাটিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, ভাই হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান পার্শী আমরা সকলেই এক। তিনি প্রথম যে প্রবন্ধ কোন কাগজে লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রথমে এই লেখা The Govt. has done every thing for···and nothing for...এই সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া উক্ত মহাত্মা বিচারপতির আসনে বসিয়া বিচার করিতেন। তাঁহার জীবনে নিরপেক্ষতা আমরা দেখি নাই। তাহার ফলে আজি ভাগীরথীর পদ্মারূপে এক প্রকাণ্ড শাখা সমুদ্রের দিকে পাঠাইলেন, জাতীয় শক্তি দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, একে অন্যের আততায়ীরূপে বিভাগ করিলেন। এই মহাকার্য্যের জন্যই তিনি রাজার নিকট অত্যন্ত সমাদৃত, কিন্তু তাঁহার এই বিরাট অকার্য্যের ফল ভবিষ্যতে যে কি ভীষণ ভাব ধারণ করিবে, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তাহা বলিতে পারে না।

এদিকে তাঁহার ফল অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর প্রতিফলিত হইল, আর একদল সুরেন্দ্রনাথের উপর সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া একদিকে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন আসিল, আমি তাহা সমগ্র লিখিতে পারিলাম না। যদি অবসর পাই, তবে লিখিতে পারিব। নতুবা সুরেন্দ্র-কাহিনী আমার এই স্থানেই শেষ করিতে হইল।

এক্ষণেও সেই মহাপ্রাণ স্বদেশানুরাগী মহাত্মা বার্দ্ধক্যেও দেশসেবা করিতেছেন, তাঁহার প্রাণ মন সেই মহান কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, ইংরেজের মহান তেজ ও বাগ্মীতা, লিখিবার শক্তি, ও শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া আজি তিনি দেশের সর্ব্বপ্রধান নেতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশের Uncrowned king, সুরেন্দ্র মাতৃভূমির সেবা করিতে করিতে নিজেই বঙ্গদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্গের বা ভারতের মঙ্গলই তাঁহার মঙ্গল, সেই কার্য্য, সেই লক্ষ্য। ঈশ্বর সুরেন্দ্রনাথকে ভারতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ভারত-মাতা সুরেন্দ্রনাথকে বরপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি শেষ কাল পর্য্যন্ত দুঃখিনী মাতৃভূমির সেবা করিয়া তাহার অশ্রু মোচন করেন, এইরূপ শক্তি তিনি তাঁহাকে প্রদান করুন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

গুপ্ত কথা।

বর্দ্ধমান জেলায় মেমারী ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে রায়পুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে যদুনাথ রায় একজন প্রতাপশালী নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে ভালবাসিত না, শ্রদ্ধা করিত না এমন ব্যক্তি কেবল রায়পুর কেন, পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচখানি গ্রামেও কেহ ছিল না। তিনি উক্ত গ্রামের জমিদার রায়েদের জ্ঞাতি।

পূর্ব্বে তাঁহার পিতার সহিত বর্ত্তমান জমিদারের পিতার খুব মনোমালিন্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহা মিটিয়া গিয়াছে, কারণ যদুনাথ তাঁহার পিতার ন্যায় জমিদারির উপর দাবী দাওয়া করেন না। নানা কারণে তাঁহাকে রায়পুরের জমিদার বিজয়বাবু যথেষ্ট সমাদর ও মান্য করিতেন। জ্ঞাতি-সম্পর্কে যদুনাথ তাঁহার ভ্রাতা।

যখন বাটীতে কোনও কাজ কর্ম্ম হইত, বিজয়বাবুর আগ্রহাতিশয্যে যদুনাথ তাঁহার বাটীতে গিয়া সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সুবন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। বলা বাহুল্য বাটীর সর্ব্বত্র তাঁহার অবাধ গতি ছিল।

প্রতি বৎসরই খুব ধুমধামের সহিত রায়েদের বাটীতে দুর্গোৎসব হইত। এক বৎসর নবমীপূজার দিন যদুনাথ বাটীর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আদর অভ্যর্থনা করিতে করিতে কোনও কাজের জন্য দ্বিতলের জমিদার বাবুদের পূজাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন শ্বেত পৈতাধারী নামাবলী গাত্রাভরণী শোভিত, গৌরবর্ণ এক ব্রাহ্মণ নিবিষ্ট মনে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, বদনমণ্ডল দেখিলে মনে হয় যেন শত চিন্তাভারে মলিন!

যদুনাথ অনেকক্ষণ এই লোকটীর মুখ-পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাঁকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। হঠাৎ তাঁহার সহিত উক্ত ব্রাহ্মণের দৃষ্টিবিনিময় হইল। যদুনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিনিও যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত পৈতা জড়াইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যদুনাথ অগত্যা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার অবসর পাইলেন না।

(২)

ব্রাহ্মণভোজনের সময় যখন যদুনাথ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়ন ও পরিদর্শন করিতেছেন, তিনি দালানের এক কোণে প্রোক্ত ব্রাহ্মণকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলেন। তখন তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীর, গভীর চিন্তাযুক্ত। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া যদুনাথ বিস্মিত হইলেন এবং একটু দ্রুতপদে বিজয়বাবুর নিকট গিয়া তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যদুনাথের মুখে ব্রাহ্মণের বিষয় সম্যক অবগত হইয়া বিজয়বাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! তিনি ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন—"যদুদাদা, আপনাকে গোপনে বলি, আপনি যাঁহাকে দেখিয়াছেন উনি মানুষ নন ব্রহ্মদৈত্য। উহাঁকে আমরা অনেকে ২।৪ বার দেখেছি। উনি ঐরূপ বিমর্ষই থাকেন। আপনার খুব সাহস ও মনের'জোর আছে জানি, আপনি একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি কি চান—আমাদের দ্বারা ওঁর কোনরূপ উপকার হতে পারে কি না।"

ব্রহ্মদৈত্যের নাম শুনিয়াই যদুনাথের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আশৈশব সংস্কার বশে তাঁহার নিকট গমন করা এবং অবহেলে জীবনদান করা একই কথা। কিন্তু এক্ষণে প্রাণের চেয়ে মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। মনে ভাবিবেন, যদি কোন অছিলায় তিনি না যান তাহা হইলে পাঁচখানি গ্রামের তাবৎ লোকে তাঁহাকে আর পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠাবান, সৎসাহসী জ্ঞান করিবে না। অগত্যা যদুনাথ স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি তোমরা ঠিক পিছনেই থেকো, খুব সাবধান, দেখো যেন ডাকিবামাত্রেই তোমাদের সাহায্য পাই, কারণ আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।"

বিজয়বাবু স্বীকৃত হইলেন। যদুনাথ ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ব্রহ্মদৈত্য উদ্দেশ্যে মৃদু পাদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন।

(৩)

ব্রহ্মদৈত্য এখন হলঘরের কোণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় পূজাগৃহে আসিয়া বসিয়াছেন। যদুনাথ ধীরে ধীরে সভয়ে তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া যোড়করে শিরস্পর্শ করিয়া কহিলেন—'প্রণাম' (তাঁহার ভয় হইল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে পাছে তাঁহার ঘাড় মটকাইয়া দেয়!)—। খুব স্পষ্ট অথচ অনুনাসিক-স্বরে ব্রহ্মদৈত্য কহিলেন—'তথাস্তু'।

যদুনাথ অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"আজ্ঞে আপনি কে, নিবাস কোথায়?"

ব্রহ্মদৈত্য একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আমি একদিন এই বাটীর মালিক ছিলাম। বিজয় আমার পৌত্র।"

যদুনাথ তখন সাহসে ভর করিয়া কহিলেন—"আপনার প্রয়োজন বা অভাব কি জানাইলে আমরা যদি তার উপায় করিতে পারি—"

উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ব্রহ্মদৈত্য বলিলেন—"পারিবে, তুমিই পারিবে। তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদিন আমি কতবার দেখা দিয়াছি, কিন্তু বিজয় বা বাটীর চাকরদের কাহারও এমন সাহস হয় নাই যে আমার সহিত কথা কয়। তা'রা কাপুরুষ! তুমিই শুন, তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি; সেইজন্য হল-ঘরে তোমাকে আবার দেখা দিয়াছিলাম। আমার এক গুপ্ত কথা আছে তোমাকেই বল্‌তে চাই।"

ব্রহ্মদৈত্যের কথায় যথেষ্ট সাহস পাইয়া যদুনাথ বলিলেন—"আজ্ঞে করুন"।

ব্রহ্ম—'দেখ, আমার কতকগুলি গুপ্তধন আছে সেগুলির মায়া আমাকে এখনও আবদ্ধ রেখেছে—আমার ঊর্দ্ধে উঠিবার পথ রুদ্ধ করেছে।' পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমি যেন কেমনতর হয়ে গেছি। কা'কেও সাহস করে ঐ টাকার কথা বল্‌তে পারি নি, কারণ উহার সহিত কতকগুলি কাগজপত্র আছে। তাহাতে এই জেলার একটী জমিদার-বংশের গুপ্তকথা লেখা আছে। তোমাকে আমার অনুরোধ, ঐ কাগজের দপ্তর না খুলে একেবারে অগ্নিকুণ্ডে দাহ কর্‌বে। কারণ সে কলঙ্ককাহিনী কোন ক্রমে প্রকাশ পাইলে কতকগুলি লোকের সমাজে বাস করা অসম্ভব হ'বে। বল, প্রতিজ্ঞা কর, তুমি ঐ কাগজের দপ্তর না খুলে দাহ কর্‌বে?"

মন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় যদুনাথ বলিলেন—"নিশ্চয়, প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

একটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া ব্রহ্মদৈত্য কহিলেন—"শুনে খুব সুখী হলুম। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই তোমার হাতে ঐ গুরু কার্য্যভার দিলাম। আর এক কথা, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।"

বিস্ময়ের সহিত যদুনাথ বলিলেন—"আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী!"

ব্রহ্ম—হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার পিতামহ আমার সহোদর ছিলেন। শুনে অবশ্য তোমার কষ্ট হবে, তা'কে ঠকিয়ে—প্রতারণা করে আমি অনেক বিষয় ল'য়েছিলাম, আমার জীবিত অবস্থায় হঠাৎ একদিন তা'র মৃত্যু হয়, তার এক মাস পরে তোমার পিতামহের প্রেতমূর্ত্তি হাসি মুখে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভয়ে আমি আড়ষ্ট হই। তার হাসি শেলসম আমার

মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হয়। সেই সময় আমার অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, তার বিষয় সম্পত্তি তার পুত্র অর্থাৎ তোমার পিতাকে প্রত্যর্পণ করিলে আমার মান বাঁচিয়ে চলা দায় হইত। সেই জন্য তার বিষয় সম্পত্তির মূল্য বাবদ কতকগুলি টাকা গুপ্তস্থানে রেখেছিলাম। পাছে চোরে কোনরূপে উহা লয় সেইজন্য আমাকে পাহারা থাক্‌তে হয়েছিল। এখন ঐ টাকা গ্রহণ করে আমাকে ঋণমুক্ত কর, আর আমাকে ক্ষমা কর। বল ক্ষমা কর্‌লে?

সাশ্রুলোচনে যদুনাথ বলিলেন—"দাদামশাই! আমার ভক্তিপ্রণাম গ্রহণ করুন। জীবনে আপনার চরণ দর্শন করি নাই,আজ আপনি পরপারে থাকিয়া ও আমায় দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আমি টাকা গ্রহণ করিলে যদি আপনি ঋণমুক্ত হন, আপনার আত্মার সদ্গতি হয়, আমি টাকা লইব!"

"শুনে সুখী হলুম, এখন এস—আমার সহিত চল।" এই বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য চলিলেন এবং মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলিবৎ যদুনাথ তাঁহার অনুসরণ করলেন।

(৪)

বাটীর দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা খিড়কীদ্বারের দিকে গমন করিলেন এবং দরজার পার্শ্বে দেওয়ালে একটী স্থান হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মদৈত্য বলিলেন—"ঠিক এই স্থান—এই দেওয়ালের মধ্যে একটী ছোট লোহার বাক্স আছে। তার মধ্যে এক দপ্তর কাগজপত্র ও একটী থলিতে কতকগুলি গিণি আছে। তুমি উহা খুলিয়াই দপ্তরটী পুড়াইয়া ফেলিবে এবং গিণির থলিটী গ্রহণ করিবে। দেখিও, অন্যথা না হয়।"

যদুনাথের হস্তে তামাকু খাইবার একটী রূপার নল ছিল, তিনি ঐ স্থানটি সেই নল দিয়া চিহ্নিত করিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ব্রহ্মদৈত্য নাই!

* * *

সোৎসুকে বিজয়বাবু যদুনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে যদুনাথ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। বিজয়বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কি?" যদুনাথ একটু স্থির হইয়া বসিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন। বিজয়বাবু খুব বিস্মিত হইলেন এবং ৪।৫ জন ভৃত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই চিহ্নিত স্থানে গমন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দেওয়ালটী খনন করা হইলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন ভিতরে একটী লোহার সিন্দুক রহিয়াছে। বিজয়বাবু বলিলেন—'খুব আশ্চর্য্যের কথা বটে, আমার বাটী আমিত কখনও জানি না যে দেওয়ালের মধ্যস্থল এরূপ

কাঁপা!' তারপর বাক্স যখন ভাঙ্গা হইল এবং ব্রহ্মদৈত্যের কথামত একটী দপ্তর ও একটী থলিয়া বাহির হইল তখন, বলা বাহুল্য, সকলের বিস্ময়ের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রতিশ্রুতি মত, পাঠ না করিয়া কাগজের দপ্তরটী অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত করিয়া যদুনাথ যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সকলে শুনিতে পাইল যেন একটা মুক্তিশ্বাস শূন্যে উঠিয়া বিলীন হইয়া গেল! সমবেত সকলের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যদুনাথ কোন ক্রমেই গিণির থলি লইতে রাজী হইলেন না। বিজয়বাবু বলিলেন, "দেখ, পিতামহ ঐ টাকার জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—উহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ উহা লইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।"

অগত্যা যদুনাথ দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

বিধবা।

১

বেঁধেছিলে খেলাঘর বালুকা-বেলার 'পর, সেজেছিলে কণক ভূষায়,
ভালবেসে ভালবেসে তোমারে সাজাতো যে সে, রবি যথা সাজায় উষায়;
তাহারে বাসিয়া ভালো, নয়নে নাচিত আলো, সারাদেহে খুঁজেছিলে তা'রে,
মরম-গহনে নামি' বিরহে দিবসযামী চেয়েছিলে প্রাণে আঁকিবারে—
মিছে চাওয়া মিছে খোঁজা, জীবনে গেল না বোঝা—বুঝেছিলে ভালবাসো শুধু
বোঝোনি বালুকাতীর, বিশাল সুনীল নীর, তা'রি মাঝে করিতেছে ধূ ধূ!
পেতেছিলে যে সংসার, ভাবিতে তাহাই সার,—মনে হ'তো আর কিছু নাই—
সেই ভূষা সেই বেশ, রেশমিত ঘন কেশ, ভুলেছিলে তাহা লইয়াই।

২

যে দিন প্রথম-ও শেষ দেখিলাম সেই বেশ—সে উজ্জ্বল মনোরমা সাজ—
কণক-হীরক-রাগে শ্রীঅঙ্গ-সুষমা জাগে—সে মাধুরী মনে পড়ে আজ :—
প্রমত্ত ঝটিকাবেগে বারিধি উঠেছে রেগে তরঙ্গিত শতফণা তুলি,'
তা'রি একটীর শিরে, প্রাণ-প্রিয় সাথীটীরে আঁকড়িয়া উঠেছ আকুলি'—

নয়ন নিমেষহারা, হৃদয়ে নাহিকো সাড়া, দুটী তারা আঁখি কোলে স্থির,
আননে আবেগ নাহি, যেখানে দেখিছ চাহি সীমা সেথা নাহি ধরণীর।
মেঘে ঢাকা চারিধার, অন্ধকার—অন্ধকার—মাঝখানে দীপ্তিময়ী তুমি,
যেন বা আঁধার টুটি' সাগরে উঠেছ ফুটি' আলোকিতে শত চিত্তভূমি!

৩

পলক—পলক মাত্র! তারপর? সর্ব্বগাত্র স্বেদজলে হয়ে আসে হিম—
তরঙ্গ চুমিল আসি, জলধি-সলিল রাশি অপ্রমেয়, অনন্ত, অসীম!......
নাহি আর সাড়া শব্দ, সব শূন্য—সব স্তব্ধ, দোলে শুধু নীল পারাবার,
ভেসে গেছে খেলাঘর, ডুবিয়াছে বালুচর, চিহ্নমাত্র নাহিকো তাহার।
রচি' ঘন ব্যবধান ভেঙেছে তরঙ্গখান্—মহাকাল-সাগরের জল
আবার আলোকে হাসি, ছড়াইয়া গীতিরাশি, বহিতেছে ছল্ ছল্ ছল্;
হাসে চন্দ্র হাসে তারা, রূপরসগন্ধ ধারা মেশামেশি করিছে আবার—
তুমি এক নব দেশে লাগিয়াছ ভেসে এসে, চলে গেছে যে জন যাবার!

৪

মরি, মরি, এ কি রূপ! অপরূপ, অপরূপ! কোথা সেই বেশ ভূষা সাজ?
প্রিয়তমে খুঁজি' খুঁজি', সাগরের সনে বুঝি' হারালো কি জলতল-মাঝ?
যাক্, যদি গেছে তাহা, বলিব না 'আহা, আহা'—এ সাজই যে মানায়েছে ভালো!
কুবেরের রত্নরাজি খুলে ফেলে "নন্দী" আজি দেছে পথ শ্রীচরণ-আলো!
মুখপানে চাহি যার খুলেছিলে হৃদি দ্বার, সে যদি গো সাগরের জলে—
আর কেন? তবে জাগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও মাগো! সুবিপুল চন্দ্রাতপ-তলে;
ভাবো সে আকাশে আছে, ভাবো সে বাতাসে আছে, ভাবো সে মিশায়ে আছে মেঘে—
ঘুচে যাবে ব্যবধান, ছুটাও ছুটাও প্রাণ, নব তেজে মনোরথ-বেগে।

৫

আজ তব খেলাঘর ব্যাপ্ত দূর দিগন্তর, চূড়া তা'র ঠেকেছে গগনে!
হৃদয় বাঁধনহীন, নহে সে পাঁজরে লীন, খুঁজে ফেরে মিলন-লগনে;
পাখীর কাকলী টুটি' তা'রি স্বর ওঠে ফুটি' বায়ু আনে তাহার পরশ,
উজল তারকা-কোলে তা'রি চাহনিটী দোলে—এ কি মহা মিলন-হরষ!
বুকের ভিতরে চাও—কি দেখ? কাহারে পাও?—জুড়ে আছে জুড়ে আছে মন,
বাহিরে, অন্তর মাঝে, সব শূন্য ভ'রে আছে! কি করিয়া—ভরিল কখন্?
জীবনে মানবমাত্র ছিল যে প্রণয়পাত্র, দেবতা সে সেজেছে মরণে,
তাই তব মুখে চোখে, সাধনায় সুখে শোকে, দেখা দেয় বাহিরে স্মরণে।

৬

তরঙ্গ-দোলায় ভেসে, যে দ্বীপে এসেছ শেষে, এখানে যে সকলি নূতন—
নাহিকো আবেশ স্পর্শ, নাহিকো চপল হর্ষ, এ যেন গো পুণ্য তপোবন!

আকাশে সাগরে হেথা, বুকে বুকে চলে কথা—নীলিমায় ঘেরা চারিধার,
তল্ তল্ ছল্ ছল্ দুলিছে সুনীল জল, মাঝখানে আসন তোমার ;
দূর আজ বড় কাছে, প্রিয় যে গো দূরে আছে,—প্রাণ তব বিশ্ব জোড়া আজ,
বুঝিতে পারোনি যাহা, খুঁজে কি মিলেছে তাহা, নবীন এ জীবনের মাঝ ?
দূর করি সব তুচ্ছে, দাঁড়ায়েছে বহু উচ্চে, মহাযোগ করিয়াছ সার,
ছিলে শুধু প্রিয়া তা'র—আজ তুমি মা আমার, নিখিলের মানব সভার !

৭

ওপারের আলো এসে, পড়েছে ললাটদেশে, সমুজ্জ্বল রেখায় রেখায় !
এ পারের কান্নাহাসি বাতাসে বাতাসে ভাসি ক্ষীণ স্বরে কাণে যেন যায়—
চেনা চেনা ভাবো কভু, চিনিতে পারোনা তবু, নয়নে কি লেগে আছে যেন !
কি সুখে ইহারা নাচে ? কি লইয়া ভুলে আছে ? তোরে দেখে কেঁদে মরে কেন ?
কে ওই সাগর-তীরে ডাকিছে না—'এসো ফিরে' ? ফিরোনা মা, ওরাই আসুক—
অর্দ্ধপথে আসিয়াছ, মহালক্ষ্যে ভাসিয়াছ, শক্তি থাকে ওরাও ভাসুক ;
গরিমা-শিখর 'পর, বেঁধেছ পূজার ঘর, উহাদেরো সেই দিকে ডাকো,
প্রিয়-আরাধনা ছলে নামি' নিজ হিয়াতলে আপনারে জাগাইতে থাকো !

৮

দাঁড়াও মহিমাময়ি ! বিপুল বাসনাজয়ি ! আদর্শের শ্বেত শতদলে,
দিশেহারা উর্ম্মি যত, ঘুরে ঘুরে হ'ক নত তোমার ও চরণের তলে !
অরুণ-কিরণ-রাশি শ্রীমুখে উঠুক ভাসি'—গ্রহে গ্রহে ছুটুক্ আলোক,
বিস্ময়-উথল প্রাণে, চাহি ও আনন পানে মুগ্ধ হ'য়ে যাক্ সপ্তলোক !
উদাস নয়ন-বিভা, নিশাকে করুক দিবা, তোল' বুকে সাগরের তান !
তোমার চরণ সেবি, মহোল্লাসে মোরা দেবি ! গাই মহা-মিলনের গান !
তোমারে ফিরাতে এসে, অতীতের মরুদেশে, লাজে নত যাক্ এরা ফিরে—
শুভ্র তব বস্ত্রখানি, সুচির-পবিত্র মানি' ধরি মোরা বুকে, পিঠে, শিরে !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

কামক্রোধাদি-সঙ্কুল এই সংসার স্বপ্নতুল্য। যতক্ষণ মানব অজ্ঞান স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া থাকে ততক্ষণই উহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন যেমন

অমূলক ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের প্রবোধনে সকলই অসত্য, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রামহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমবিরেণা ধিগচ্ছতি॥" ৩৮-৩৯

—গীতা ৪র্থ, অধ্যায়।

"ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারক আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মনুষ্য কাল সহকারে স্বতঃ এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যাবতীয় সাধনের মধ্যে জ্ঞান সাধনই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম, উপাসনাদিদ্বারা পাপ আদি দূরীভূত হইলেও তাহার হেতুভূত অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না।

প্রথম অংশ।

এই অনন্ত রহস্য ভাণ্ডার, অসীম ভাবময় ধরাধামে জন্মলাভ করিয়া অহর্নিশ কত আশ্চর্য্য, কত বিস্ময়কর, কত শত জটিল কুটিল ব্যাপার দর্শন করিলাম কিন্তু হায় কোন্ বিষয় জানিবার জন্য মন ব্যগ্র হইল? কোন্ জিজ্ঞাসা ধর্ম্ম আচরণ করিলাম, আর কি সিদ্ধান্ত ফলই বা লাভ করিয়া চলিলাম? আহা! আমি কে? কেন জন্মিলাম? কি করিতে আসিয়াছিলাম এবং কি করিয়াই বা চলিলাম কিছুই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। হায়রে! সংসার-সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় সমাজ-স্রোতে ভাসিয়া গেলাম!—অজ্ঞানান্ধ বৃক্ষাদির ন্যায় পৃথিবীর এক নিভৃততম অঙ্কে জন্মিলাম, শাখাপল্লব স্বরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিলাভ করিলাম, ফল পুষ্পবৎ পুত্র কন্যা লাভ করিলাম—আর মরিলাম। কেন জন্মিলাম, কেনই বা মরিলাম কিছুই বুঝিলাম না। বুঝিতে চেষ্টাও হইল না। আমি মনোজ্ঞ, চিন্তাশীল জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি—কিন্তু আমার চৈতন্যের পরিচয় কোন্ কার্য্যে? জ্ঞানের পরিচয়ই বা কোথায়? এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কোনও বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে যাহার প্রবৃত্তি হইল না, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আশ্চর্য্য কাণ্ডের কোনও বিষয়েই যাহার জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল না, তাহার চৈতন্য কোথায়?

এ জগতে যত কার্য্য হয় সে সকলই এক মহৎ উদ্দেশ্য পরিচালিত। এখান-

কার ধূলি কণিকাটি পর্য্যন্ত বিনা উদ্দেশ্যে স্থানচ্যুত হয় না। অঙ্কুর উদ্‌গত বৃক্ষ বর্দ্ধিত, পুষ্প বিকাশিত, ফল পক্ব হয়, এ সকলেরও পশ্চাতে মহান্ উদ্দেশ্য অবস্থিত।

এই যে সর্ব্ব বিস্ময়ের আধার বিশ্বরাজ্য, অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, অগণ্য তারকামালা, লোকলোচন, বিশ্বকর্ত্তা, তমোবিনাশী সূর্য্যদেব! অথবা এই জীব-সংঘের উৎপত্তি, স্থিতি বা মৃত্যুর আশ্চর্য্য অভিনয়! এ সকলের স্রষ্টা, দ্রষ্টা, নিয়ন্তা কেহ আছে কি? ইহা কি উদ্দেশ্যবিহীন? কাহার আদেশে দিনমণি সারাদিন আকাশ-পথে বিচরণ করেন, কাহার নিদেশ পালনে নিশাগমে চন্দ্রদেব মৃদু মধু হাসিতে জগৎ আনন্দিত করেন, কাহার ইচ্ছায় অহরহঃ মানব ভাগ্য জন্ম, মৃত্যু জরার অধীন হইতেছে? কেহ আছে কি? যদি থাকে সে কোথা? কি রূপ? দেখা যায় কি? আমার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি? হা—রে মন, এ জিজ্ঞাসাটিও তোমার অন্তরে কথনও স্থান পাইল না। মনরে! সেই শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ রাজার রাজা রাজাধিরাজের বিষয় জিজ্ঞাসায় তোমার মতি হইল না! ধন্য তুমি! আর ধন্য তোমার মানব নামের মহিমা। মন! তুমি চিন্তাশীল বলিয়া গর্ব্ব কর—তোমার চিন্তাশীলতার পরিচয় কিসে? যদি এমন ভাবিবার বিষয় থাকিতে—তুচ্ছ বিষয় চিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারও এ চিন্তায় মনাকর্ষণ করিতে না পারিলে, তবে তোমার ভাবনার ফল কি? এমন শ্রেষ্ঠ চিন্তামণির চিন্তা যদি চিত্তে স্থান না পাইল, তবে কি চিন্তা করিয়া কাল কাটাইলে?

আচ্ছা মন! যাক্—যদি এ সকল চিন্তা করিতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, যদি এ সকলও ত্যাগ কর—কিন্তু "তুমি" 'তোমাকে' ত্যাগ করিতে পারিবে কি? না, না তা পারিবে না! মন! তুমি কে—তুমি কি শরীর না শরীরাতীত কোনও বস্তু? সূর্য্য চন্দ্র এবং বিশ্বস্রষ্টা তাহারা পর বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে কিন্তু তোমাকে ত তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তাই বলি মন! এই যে অহর্নিশ তোমার সম্মুখে কত লোক এই সংসারধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে—তুমি বলিতেছ, উহা উহাদের মৃত্যু। মনরে! এ মৃত্যু কি? এ মৃত্যুর পর আর 'তুমি' বলিয়া কিছু থাকিবে কি? না, এই মৃত্যুই সকলের শেষ।

যুগ, যুগান্তর হইতে এই এক মীমাংসা চলিয়া আসিতেছে—অবিরামগতিতে চলিতেছে—কিন্তু কই শেষ কোথায়? বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি

এই শরীর ব্যতীত 'আত্মা' বা 'জীবাত্মা' বলিয়া আর এক পদার্থ আছে সেই পদার্থই 'আমি'। সে আমি মৃত্যুর পর পুণ্যাদি কর্ম্মফলে স্বর্গাদিতে গমন করিব। কিন্তু কই একদিনও ত সে 'আমি'র দেখা পাইলাম না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু দেখিব আর কেবল আমাকে আমি দেখিতে পাইব না। এ যে বড়ই দুঃখ। শত সহস্র যোজন দূরস্থ দ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ণয় করিবার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সূক্ষ্মাণু দর্শনের জন্য অনুবীক্ষণের সৃষ্টি হইল, কিন্তু আত্মাকে দেখিবার জন্য আত্মবীক্ষণ যন্ত্র কি সৃষ্টি হইবে না?

মনরে! তুমি দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ইত্যাদি কতই অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কতই না গ্রহ, উপগ্রহের গমনাগমন নিরীক্ষণ, সূক্ষ্ম বালুকণা বিশ্লেষণ করিতেছ। বাষ্পীয় যন্ত্র নিম্মাণ করিয়া কতই দূর গমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছ। কত অদ্ভুত দেশ কত শত আশ্চর্য্য আকৃতি দর্শন করিতেছ কিন্তু একবার তোমার ঘরের জিনিষ, তোমার প্রিয় হইতেও প্রিয় পদার্থের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। চিরজীবন পরপ্রত্যাশী হইয়া পরের সৌভাগ্যে নিজ সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া, পর ভাবিয়া ভোর হইয়া গেলে, একবার আপন চেষ্টা করিলে না, আত্মরূপ, আত্মৈশ্বর্য্য, আত্ম আকৃতি, আত্মশক্তির বিষয় জানিতে চেষ্টাও করিলে না। আমরা আবার চেতন পদার্থ বলিয়া অভিমান করি! আমরা যে বৃক্ষ প্রস্তর তুল্য জড়বস্তু বিশেষ।

মন! তুমি একজন সুদক্ষ শিক্ষক বলিয়া অভিমান কর। শত শত বালককে বিদ্যা ও জ্ঞান চক্ষুদানে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছ বলিয়া সতত আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক। কিন্তু মন! ভাবিয়া দেখ দেখি; বিদ্যা ত অনেক দান করিয়াছ, জ্ঞানও অনেক বিতরণ করিয়াছ; কিন্তু বিদ্যা যে কি পদার্থ জানিয়াছ কি? আত্মবিদ্যা ব্যতীত যে সকলই অবিদ্যা। আত্মজ্ঞান লাভে স্বীয় অজ্ঞান পশুত্ব দূর করিতে পারিয়াছ কি? আত্ম চৈতন্য লাভে আপনি কি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছ? মনরে নিজে মানুষ না হইলে কি অপরকে মানুষ করিতে পারা যায়? অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে?

ওহে ছড়ি-শিশি-যুড়ীধারী ভিষকরাজ! তোমার অভিমানের অন্ত নাই। যখন প্রাণের দায়ে লোক তোমার শরণাপন্ন হয় তখন তুমি নিজেকে বিধিকল্প জ্ঞান করিয়া থাক। তোমার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে কত লোক অকালে কাল-কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু মনোরূপী চিকিৎসক তোমার স্বকীয় ব্যাধি আরোগ্যের কি করিতেছ? ঐ যে

তোমার বক্ষঃস্থল অজ্ঞান শ্লেষ্মা দ্বারা আক্রান্ত, তাহার উপায় কি করিতেছ? তুমি আছ কি নাই, যখন জান না, তখন তুমিও যে মৃত সে বিষয়ে একবার ভাবিয়াছ কি? মনরে! শুনেছিস্ ত? লোকে বলে "চাচা আপন বাঁচা"। মন! পরের চিকিৎসা পরে করিও, আগে আত্মব্যাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ কর। তুমি নিজে রোগাক্রান্ত, তুমি কি করিয়া পরের চিকিৎসা করিবে?

হে ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মধ্বজবাহী অলকা-তিলকা-খচিত মহাকায় পরম ভাগবতমন বাবাজি! তুমি ত দিব্যচক্ষে বৈকুণ্ঠবিহারী হরির কেলিকুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ধামই প্রত্যক্ষ করিয়াছ, আর সর্ব্বদা লীলা রসময় হরির স্বরূপ, অরূপ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি কত রূপই বর্ণনা করিতেছ! কিন্তু হে মন বৈষ্ণব! একবারও আত্মরূপ দর্শন করিয়াছ কি? কখনও দেখিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছ কি?

যে আপনাকে জানে না, আপন জন্মমৃত্যুর কারণ অথবা পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে কোন্ সাহসে পরের তত্ত্ব জানিতে চায়?

কোনও বেদপাঠক চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর নিরাকার। কেহ বা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর সাকার! কেহ বলিতেছেন, ঈশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ। আবার কেহ বা ধীর গম্ভীর নাদে বলিতেছেন, ঈশ্বর সর্ব্বরূপ, আবার কেহ বা যুক্তি ও তর্কের বিতণ্ডাজাল বিস্তার করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেছেন, "ঈশ্বর নাই"। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কি মুগ্ধতা! সেই ঈশ্বর নিরাকারবাদী বাগ্মীপ্রবর একবারও চিন্তা করিতে অবসর পাইলেন না যে তিনি নিজে সাকার কি নিরাকার, একবার নিজের কাণে হাত দিয়া দেখিলেন না যে তিনি নিজে আছেন কি নাই। আর সাকারবাদীও একবার আপনার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন না যে তিনি স্বরূপ কি অরূপ। বলি মন! তুমি কি জান না—যে "আপনি বাঁচলেই বাবার নাম"—ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, আছেন কি নাই—তাহা তিনিই ভাবিতে থাকুন। তোমার সে বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া কাজ নাই—তুমি আপন চরকায় তেল দেও—ঈশ্বর যদি সাকার হন, তোমার কথাতে তিনি নিরাকার হইবেন না। আর যদি তিনি নিরাকার হন, তোমার যুক্তি বা তর্কে তিনি সাকার হইবেন না। তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও তাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইবে না। এখন তুমি নিজে সাকার কি নিরাকার, আছ কি নাই—একবার চিন্তা কর—পরের কথা পরে ভাবিও।

মন! পরের কথায় তোমার কাজ নাই, পরহিতৈষী ও পরোপকারী বলিয়া বাহাদুরী লইবার ভণ্ডামী ত্যাগ কর। কেহই কাহারও উপকার করিতে পারে

না। কেহই কাহারও অপকারেও সমর্থ নহে, যদি কেহ সকলের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা থাকেন, তিনি ইচ্ছা করিলে উপকার বা অপকার করিতে পারেন। মনরে! এখন একবার আপন ধরিয়া আপন ভাবিয়া আপনার হও।

"আপনাতে আপনি থেকো মন্,
যেওনারে কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন এই পরশ মণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।
কত মণিরত্ন পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥"

—৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কর্ত্তৃক গীত।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

প্রতিশোধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সে কি ভীষণ ভীতিচমকপ্রদ ভগ্নকঠোর কণ্ঠস্বর!—কি ঘৃণারোষোত্তেজনাময় তীব্র আহ্বান! কায়কোবাদ আতঙ্কে আবার শিহরিলেন। বাদশাহ হইলে কি হয়, পাপীর মন দুর্ব্বল। কায়কোবাদ দুর্দ্দান্ত হইলেও বড় কাপুরুষ ছিলেন। বীরোচিত ভাব তাঁহার মোটেই ছিল না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি বড় বিলাসী ছিলেন। বীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি রমণী সংসর্গেই বেশী মিশিতেন। কূট রাজনীতি পর্য্যালোচনার পরিবর্ত্তে কামেন্দ্রিয়ের সেবা করিতেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন। সুতরাং রমণী-অঞ্চলাশ্রয়বাসী কামুক লম্পটের সাহস বা মনের বল কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, কায়কোবাদ অস্ত্র ধারণে তেমন সক্ষম ছিলেন না বটে, কিন্তু সিরাজি পূর্ণ পেয়ালা ধরিতে বিশেষ পটু ছিলেন। যুদ্ধের নামে তিনি মনে ভয় পাইতেন বটে, শত্রুর রোষকষায়িত লোচন দেখিলে তাঁহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিত বটে, কিন্তু যখন কামলালসাময়ী, শিথিলবসনা, প্রফুল্ল-যৌবনা সুন্দরী ললনাকুল হাস্যস্ফুরিত অধরে তাঁহার চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের সুরা-রাগ-

রঞ্জিত নয়নকোণে সুকৃষ্ণ মণি ঘুরাইয়া, অনঙ্গের অতৃপ্ত-আকাঙ্খা উদ্দীপিত বিলাস-বাণ হানিত, তখন তিনি অবিকৃতচিত্তে সে সময়ে তীরের মুখে বীরের মত বক্ষ পাতিয়া দিতেন। তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত, বিরক্ত বা ভীত হইতেন না। সে বিষয়ে কায়কোবাদ বড় সাহসী ছিলেন!

কুমুদ ডাকিলেন—কায়কোবাদের বোধ হইল, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমান মৃত্যু, তাঁহাকে অনন্তনিরয়ে লইয়া যাইবার জন্য যেন অমানুষিক কণ্ঠে আহ্বান করিতেছে! সভাস্থ সকলেই অবাক্! সকলেই কুমুদকে ঘোর উন্মাদ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে যে হতভাগ্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে, কিম্বা তাহার মুণ্ডটা দেহচ্যুত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ হইলেন! কেন না কুমুদ প্রথমে ত প্রতাপান্বিত দিল্লী সম্রাটের সম্মুখে 'কুর্ণিস' করিলেন না, মাথাটা একটু নোয়াইয়া একটা সামান্য সেলামও ঠুকিলেন না, বাদসাহের পক্ষে ইহা কম অপমানের কথা নয়! তার পর প্রকাশ্য রাজদরবারে মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মুখে অবজ্ঞা ভরে বাদসাহের নাম ধরিয়া আহ্বান, কম সাহসের কাজ নয়! কুমুদ নিঃসঙ্কোচে তাহাও করিলেন, সুতরাং লোকে যে তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর তাঁহার অদৃষ্টে যে কারাভোগ বা মৃত্যু তাহাতেই বা সন্দেহ কি? সকলে ভাবিলেন লোকটা কে—পতঙ্গের মত ইচ্ছা করিয়া অনলে প্রাণ দিতে আসিয়াছে? মন্ত্রী জালালুদ্দিন কুমুদের এই অবজ্ঞা পূর্ণ ব্যবহারে একটু বিরক্ত হইলেন; তিনি ঈষৎ কঠোর স্বরে কহিলেন—"যুবক! সাবধান হইয়া কথা কও! কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ জান?"

কুমুদ নির্ভীকচিত্তে সদর্পে উত্তর করিলেন—"জানি, একজন নরঘাতক, পরস্ত্রীঅপহারক দুর্দ্দান্ত দস্যুর সম্মুখে,—এক নররূপী রাক্ষসের সম্মুখে আমি কথা কহিতেছি!" বাস্তবিক কুমুদ তখন উন্মত্ত! কোথায়, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন তাঁহার তখন সে জ্ঞান নাই!

উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত! কায়কোবাদ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সামান্য একটা 'কাফের' যে এতগুলা লোকের সম্মুখে অপমান করিবে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে ভয় থাকিলেও তিনি ক্রোধ-ঘূর্ণিত কটাক্ষে উদ্ধতস্বরে কহিলেন—"অসভ্য উন্মাদ। কে তুই?"

বলা বাহুল্য কুমুদসিংহকে আর কেহ চিনিতে পারুক বা নাই পারুক,

কায়কোবাদ ও জাফরখাঁ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কায়কোবাদ সন্দিগ্ধভাবে যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুই ?' সেটা তাঁহার ভাণ মাত্র! কুমুদ বিস্মিত হইলেন। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন—"এত শীঘ্র আমায় ভুলিয়াছ কায়কোবাদ ? তুমি জান না—আমি কে ? ভাল করিয়া দেখ দেখি, চিনিতে পার কি না ? দেখ, মনে হয় কি, একদিন একজন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তোমার বিপদে মাথা দিয়াছিল যাহাকে তুমি প্রাণ-দাতা বন্ধু বলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলে, কত ধন্যবাদ দিয়াছিলে, পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলে, স্মরণ হয় কি ? আমি সেই তোমার প্রাণদাতা বন্ধু—সামান্য রাজপুত ব্যবসায়ী কুমুদসিংহ! এই দেখ, তোমার হস্তলিখিত তোমার বাটীর ঠিকানা। তুমিই আমায় দিয়াছিলে!" এই বলিয়া কুমুদসিং কায়কোবাদের সম্মুখে এক খণ্ড পত্র ফেলিয়া দিলেন। কায়কোবাদের হৃদয় কাঁপিল। সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল। মাথা ঘুরিল। মন্ত্রী জালালুদ্দিন সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কায়কোবাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সকলেই সন্দেহাকুল—বিস্মিত—নির্ব্বাক! অনেকেই তখন কুমুদকে চিনিতে পারিলেন। যেদিন কুমুদসিং উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব সম্মুখে দাঁড়াইয়া জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কায়কোবাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেদিন অনেক ওমরাহই উপস্থিত ছিলেন, অনেকেই সেদিন নির্ভীক কুমুদসিংহের নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। স্বয়ং জালালুদ্দিন সেদিন তাঁহার অসম সাহস দেখিয়া, মনের অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া-ছিলেন—যুবক! তুমি যথার্থই নিঃস্বার্থ পরোপকারী! আজি কুমুদের মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার অবস্থার বিপর্য্যয় দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—কুমুদ পাগল হইয়া গিয়াছে। জালালুদ্দিন ভাবিলেন, ভিতরে রহস্য আছে! কায়কোবাদ ও জাফরখাঁ ভাবিলেন—বিপদ উপস্থিত! কুমুদের কথা শুনিয়া ও সেই লিপিখানি দেখিয়া কায়কোবাদ একটু থতমত খাইলেন। কুমুদকে সহসা কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। জাফর এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে বড় চতুর। মনে মনে ভাবিয়া দেখিল—এ সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কিছুতেই উচিত নয়। যে প্রকারে হউক, কুমুদসিংহকে তাড়াইতে হইবে। নতুবা সভামধ্যে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই বিপদ! এই বলিয়া জাফর কুমুদকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—"তুই কে কোথাকার একটা পাগল, তোকে সম্রাট চিনিবেন

কি প্রকারে ? মিথ্যাবাদি—অসভ্য জানোয়ার ! এ স্থান হইতে এখনই দূর হ ! নতুবা তোকে কারাগারে যাইতে হইবে।"

জাফরের কথায় কায়কোবাদের একটু সাহস হইল। তিনি তখন কুমুদ প্রদত্ত পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"উন্মাদ রাজপুত ! তুমি প্রলাপ বকিতেছ ! আমি কোন কুমুদসিংহকেই চিনি না। যাও—চলিয়া যাও !"

সঙ্গে সঙ্গে জাফরখাঁ বিদ্রূপচ্ছলে মুখভঙ্গি করিয়া কহিল—"হ্যাঃ ! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও ! পাগলামী করিবার কি জায়গা পাও নাই ?" সভার সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—সম্রাট কি এত শীঘ্র উপকারীর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন ? জালালুদ্দিনের সন্দেহ বাড়িল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কোন কথাই বলিলেন না। কুমুদ সবিস্ময়ে কায়কোবাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তুমি কোন কুমুদসিংহকেই চেন না ? আশ্চর্য্য ! বেশ, তুমি তোমার উপকারীকে ভুলিতে পার, কিন্তু এই সভা মধ্যে এমন কি কেহই নাই——

বাধা দিয়া কায়কোবাদ একটু উত্তেজিতস্বরে কহিলেন—না, না, তোমায় কেহই চেনে না ! তুমি যাও !

কুমুদসিংহ সরোষে ঘৃণাকুঞ্চিতবদনে কঠোরস্বরে তখন কহিলেন—"তবে তুমি মিথ্যাবাদী !" কায়কোবাদের রাগ হইল। চক্ষু আরক্তিম করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—বর্ব্বর পশু ! ক্রমেই তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে ! মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কও !

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া সহসা বিকট শব্দে কুমুদসিং হাসিয়া উঠিলেন ! সেই উৎকট হাস্যধ্বনি সেই বিস্তৃত সভাপ্রাঙ্গণে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে বজ্রনিনাদবৎ প্রতিধ্বনিত হইল ! সকলে সবিস্ময়ে কুমুদসিংহের সেই উদ্দাম-হাস্য ভঙ্গিমা-বিকৃত মুখ প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ! কুমুদ হাসিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন—"মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিব ? কাহার মর্য্যাদা রাখিব কায়কোবাদ ?—তোমার ?—বেশ, উচিত কথাই বলিয়াছ। পাপীর মুখে এ কথা শুনায় ভাল !—পাষণ্ড !—নৃশংস—নির্ম্মম ! তুমি নিরীহ প্রজার সুখ-শান্তিতে আগুন লাগাইবে,—অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়নে তা'দের হৃদয় চূর্ণ করিবে,—জোর করিয়া তা'দের ধন,মান, প্রাণ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে, আর তা'রা তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ?—এ কথা বলিতে লজ্জা হইল না ? আজ সমগ্র

দেশময় কি শোচনীয়, হৃদয়বিদারক দৃশ্য ফুটাইয়াছ বল দেখি? নারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে, দুর্ব্বলের করুণ হাহাকারে, মানহীন ব্যথিতের কাতর দীর্ঘশ্বাসে আজ দেশে কি প্রখর বিষের আগুন জ্বালাইয়াছ বল দেখি? দস্যু! তথাপি তুমি মর্য্যাদা চাও? বল দেখি, কত প্রজার অস্থি চূর্ণ করিয়া, কত প্রজার রুধির শোষণ করিয়া, কত প্রজার তপ্তঅশ্রু লইয়া তাহার উপর ওই সিংহাসন পাতিয়া, এই শোকাগ্নিপ্রজ্বলিত দেশের দানব সম্রাট হইয়া বসিয়া আছ?—তুমি মর্য্যাদা চাও? মর্য্যাদার উপযুক্ত কি কাজ করিয়াছ কায়কোবাদ! লোকের সর্ব্বনাশ ছাড়া, তুমি ত আর কিছুই কর নাই! রাক্ষস!—নরকের কীট! তোমায় সম্মান করিব? তুমিই না আমার সোনার সংসার ছারখার করিয়াছ?

এই বলিয়া কুমুদ এমন ভাবে, এমন তীক্ষ্ণকুটিল দৃষ্টিতে কায়কোবাদের দিকে চাহিলেন যে তাহাতে দিল্লী সম্রাটের মুখমণ্ডল শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তখনই তিনি সে ভাবটা লুকাইয়া, রুক্ষস্বরে বলিলেন—"চুপ্ কর বেয়াদব্! তোর নিতান্তই মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে!"

কুমুদ আবার বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন; বলিলেন—"হাঁ! মরিতেই তোমার নিকট আসিয়াছি। প্রাণের আশা ছাড়িয়াছি বহুক্ষণ! জানি জল্লাদের তীক্ষ্ণতরবারি আমার মাথার উপর ঘুরিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও কেন তুমি আমায় দ্বিখণ্ডিত করিতে হুকুম দিতেছ না!" কায়কোবাদ কহিলেন—সে তোমার সৌভাগ্য! এখনও আমি যে তোমার মত একজন নীচ—অসভ্যকে জল্লাদের শাণিত কুঠার তলে নিক্ষেপ করি নাই, ইহা আমার অনুগ্রহ বলিয়া ভাব!

"তোমার অনুগ্রহ?—পিশাচ! তুমি অনুগ্রহ করিতে জান? উত্তম, তোমার এ অনুগ্রহ আমি চাহি না! আমায় বধ কর। হুকুম দাও—তোমার জল্লাদকে ডাক!—আমি মরিব!" উন্মত্তভাবে কুমুদ সিংহ এই কথাগুলি বলিলেন। কায়কোবাদ নির্ব্বাক!—সভা নিস্তব্ধ! সকলে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল! কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদ নম্রভাবে ধীরস্বরে বলিলেন, কায়কোবাদ! তুমি অতুল প্রতাপশালী সম্রাট! তোমার অপরিমেয় অর্থবল, অসীম লোকবল! কিন্তু তাই বলিয়া, প্রজার উপর অত্যাচার কর কেন? তাহারা তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? হায়! আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম, নিজের প্রাণ বিপদে ফেলিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, আর তুমি আমার সুখের সংসার ছারখার করিয়াছ—আমার সুখশান্তি ধ্বংস করিয়াছ—আমার মান

সম্ভ্রমে পদাঘাত করিয়াছ! এই তোমার প্রত্যুপকার!—এই তোমার কৃতজ্ঞতা! অনুগ্রহ!—আমার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া—আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া—আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া আমার কি উপকার করিলে নিষ্ঠুর!—কায়কোবাদ! তোমার হৃদয়ে কি কণামাত্রও ধর্ম্মভয় নাই?—তুমি এমন অকৃতজ্ঞ—উপকারীর সর্ব্বনাশ করিতে তোমার প্রাণ একটুও কি কাঁপিল না?—ধন্য তুমি! বেশ, এখন বল, আমার পত্নী কোথায়? তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ বল! সে কি আজিও বাঁচিয়া আছে?—না মরিয়াছে? তাহাকে আনিয়া দাও কায়কোবাদ, আমি একবার দেখি!"

এই বলিয়া কুমুদ নিতান্ত কাতরভাবে দীনহীন ভিখারীর মত কায়কোবাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কায়কোবাদ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বড় গোলমাল হইয়া গেল। কি বলিবেন—কি করিবেন, তাহা সহজে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি একবার জাফর খাঁর দিকে, একবার জালালুদ্দিনের দিকে চঞ্চলনেত্রে চাহিতে লাগিলেন। জাফর খাঁও তখন ভরসা-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। জালালুদ্দিন ভাবিলেন—কাণ্ডটা গড়াইয়াছে মন্দ নয়! তিনি তখনও নীরবে বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কহা, তিনি প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন না। কায়কোবাদকে নীরব দেখিয়া কুমুদ আকুল স্বরে আবার কহিলেন—দিবে না? আমার পত্নীকে তুমি দিবে না? বেশ, না দাও, তবে এক কর্ম্ম করিও কায়কোবাদ! হতভাগিনী যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জীবিত রাখিয়া কেন লাঞ্ছনা দিবে, তাহা অপেক্ষা তা'র কণ্ঠদেশে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিও, সে জুড়াইবে! তা'র সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে! কেমন পারিবে কি? আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, কায়কোবাদ—তা'কে হত্যা করিও!—সে যেন বাঁচিয়া না থাকে! তাহা হইলে সেও শান্তি পাইবে, আমিও এ দগ্ধহৃদয়ের কতকটা জ্বালা নিবাইতে পারিব।—কায়কোবাদ! এই বুকের ভিতর যে, কি প্রখর আগুন জ্বালাইয়াছ তাহা তুমিই জান!—আমার হৃদয়টাকে তুমি চূরমার করিয়া দিয়াছ।

কুমুদ সহসা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন! কি সে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন! সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল! জালালুদ্দিনের চক্ষেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কায়কোবাদের কিন্তু বড় রাগ হইল। তিনি প্রথমে কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ তখন ভয়বিশুষ্ক! শুষ্ক কণ্ঠকে সরস করিবার চেষ্টা করিলেন। সেই সময়

জাফর খাঁ পার্শ্ব হইতে চুপি চুপি বলিয়া দিল—জাঁহাপনা! আর কেন, বেটাকে জাহান্নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন! কায়কোবাদ তখন রুক্ষ ভাবে কুমুদকে কহিলেন—দেখ্ কাফের! বার বার তোকে মার্জ্জনা করিতেছি, কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই! এখনও বলিতেছি—দূর হ! নতুবা তোর মৃত্যু নিশ্চত!

কুমুদ অবিকম্পিত কণ্ঠে দৃঢ় স্বরে কহিলেন—আমার পত্নীকে দাও, চলিয়া যাইতেছি, নতুবা এক পদও নড়িব না।

কায়কোবাদ ক্রোধে উত্তেজিতস্বরে কহিলেন—তোর পত্নী কোথায় তাহা আমি কি জানি?—মিথ্যাবাদি!

কুমুদ এইবার ভয়ানক রাগিলেন। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় অতি ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল! সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! বিষম ভাবে উত্তেজিত হইয়া, চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, তুমি জান না?—জান না? মিথ্যাবাদি!—প্রবঞ্চক!—শঠ! তুমি জান না, আমার স্ত্রী কোথায়?—আমার পিতৃব্যকে খুন করিয়া, কে আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে?—তুমিই ত! পিশাচ!—বল্ আমার স্ত্রী কোথায়?—আমার তারাকে আনিয়া দে!—এখনই আমার তারাকে চাই—ই!!

কুমুদ আর বলিতে পারিলেন না। ক্রোধাবেগবশতঃ তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল! কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল! মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া উঠিল! কায়কোবাদ সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণটা ভয়ানক বেগে কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে, ক্রোধে, কম্পিতকণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—জল্লাদ!—জল্লাদ!! সকলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু।



উদ্ভাবনবাদ।

[Theory of Evolution.]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪)

প্রথম বাদীর ঈশ্বরবাক্যই প্রমাণ। কিন্তু ঈশ্বরবাক্যের অনেকাংশ এক প্রকার চাক্ষুষ প্রমাণেরও বিরুদ্ধ; অতএব ঈশ্বরবাক্য বলিয়া প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে না; প্রমাণিত না হইলেও ইহার বিপক্ষেও প্রমাণ দেখান সম্ভবপর নহে। এই মতের বিরুদ্ধে দুই একটী যুক্তি সংক্ষেপতঃ এই, প্রত্যেক পদার্থ বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই—সাধারণতঃ সকল পদার্থই কয়েকটীমাত্র মৌলিক পদার্থ হইতে যৌগিক উপায়ে নির্ম্মিত; অতএব সৃষ্ট হইলে এই মৌলিকগুলিই সৃষ্ট হইতে স্থূল পৃথিব্যাদি একেবারে সৃষ্ট হয় নাই। পুনর্ব্বার দ্রব্যের মৌলিকতা সম্বন্ধে এক্ষণে রাসায়নিকগণের মধ্যে বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান; যেহেতু পূর্ব্বকালের সর্ব্ববাদীসম্মত মৌলিকতত্ত্ব 'জল' এক্ষণে নির্ব্বিবাদে যৌগিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; অতএব সম্ভবতঃ অনেক ইদানীং কালের মৌলিক পদার্থ কালে যৌগিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য আমাদের জ্ঞানগম্য উপস্থিত পদার্থ সকলের কোনওটীকে এক্ষণে সৃষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিবার বিষয় সন্দেহ বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ পদার্থিক জগতে আমাদিগের জ্ঞান-পরিধির মধ্যে পদার্থ বা শক্তি সৃষ্ট বা নষ্ট হইতে পারে না। ইহাই স্বতঃসিদ্ধতত্ত্ব। অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এ বিষয় এ স্থানেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। দ্বিতীয় মতের বিরুদ্ধেও কোনও প্রমাণ নাই, যুক্তিও দেখান সম্ভবপর নহে, অপিচ উহা নিজপক্ষ স্বাধীনভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম, ইহা নিশ্চয়ই উহার শ্রেষ্ঠত্ব। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে সামান্য দ্রব্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত সম্যক্ বুঝিতে গেলে স্বভাব বিজ্ঞান বিষয়ে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, জীব, উদ্ভিদ. ভূতত্ত্ব প্রভৃতি ইদানীং কালের প্রমাণিত যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জ্ঞানের আবশ্যকতা করে। একজনের জীবনের এতগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা অসম্ভব। এস্থলে যথাসম্ভব নিজ বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিয়া স্বল্পভাবে প্রধান কথাগুলিমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

(৫)

পুরাকালে জগতের আকার, প্রকৃতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই বহুল ভ্রান্তমত বিদ্যমান ছিল। পৃথিবী সমতল, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ, আকাশ কঠিন আবরণ সীমন্তে গিরি উপরি অবস্থিত। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রান্বিত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে

বিঘূর্ণিত (Geocentric-Ptolemaic Hypothesis) বায়ু জল প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবী প্রধান এবং পৃথিবীর মধ্যে মানব সর্ব্ব প্রধান, ঈশ্বর যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন ও নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতেছেন। ইদানীং অতি অল্পকালের মধ্যে পুরাকালের প্রায় সকল ধারণাগুলিই নির্ব্বিবাদে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে; বাস্তবিক তখন সকল ধারণাই প্রায় অনুমিত, সঠিক নির্দ্ধারিত বা প্রমাণিত ছিল না। এক্ষণে ম্যাগালেন, গেলিলিও, কোপার্ণিকস, কেপলার, নিউটন, হর্সেল, লাপলাস প্রভৃতি মনীষিগণের অসংখ্য পরিদর্শন পরীক্ষা ও বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোলাকার, কয়েকটী গ্রহের সহিত ইহা শূন্যপথে নিয়মিত কয়েকটী নিয়মে Keplar's Laws সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছে (Heliocentic Copernican Hypothesis) আকাশ প্রকৃত শূন্যস্থল, আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রত্যেক নক্ষত্র স্ব স্ব গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া দূরদূরান্তে বিরাজমান ও বিচরণশীল। অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নির্দ্দিষ্ট বক্র মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণন ও বিবর্ত্তন এই দ্বিবিধ গতিবিশিষ্ট এবং সমস্ত পদার্থই এক মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) নামক এক মহান নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চিরপরিচালিত। এই শেষোক্ত নিয়মের আবিষ্কার হইতে জগতে এক মহাযুগের আবিষ্কার হইয়াছে এবং মনীষিগণ পাদার্থিক জগতের প্রায় সকল কার্য্য বা ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তদবধি সৃজনবাদের লোক সংখ্যা অসম্ভবরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে বহুবিধ পরীক্ষা ও বিচার দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত হইয়া গেল যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ কন্দুকের ন্যায় হইতে পারে না। উহা কমলালেবুর ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণ অংশে কিঞ্চিৎ সমতল। বিঘূর্ণিত স্থিতিস্থাপক গোলকের কেন্দ্রাতিগ গতিতে (Centrifugal force) ঐরূপ হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। পৃথিবী সম্বন্ধে এই আবিষ্কারে দুইটী সত্য স্বতঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবী অতি পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তরল বা বাষ্পীয় ছিল; দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে ইদানীং কালের কঠিন অবস্থায় আসিতে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই বহুবিধ সামতলীয় বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। এই দুই বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এই পরীক্ষার ফলে ঊর্দ্ধস্থিত গ্রহোপগ্রহ নক্ষত্রাদিঘটিত ঘটনাবলীর মনীষিগণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দর্শাইয়া লাপলাস এক মহান অনুমান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (Nebular Hypothesis), সুদূর অতীতে পৃথিব্যাদি, গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য্য এমন কি সমস্ত

নক্ষত্রমণ্ডল এক সময়ে এক মহা বিশাল ঘূর্ণায়মান গোলাকৃতি উত্তাপোজ্জ্বল সূক্ষ্মতম বাষ্পাণু আকারে (Protyle) অসীম শূন্যকুক্ষি পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান ছিল। বিঘূর্ণনে উৎপন্ন মহাগোলকের বিষুবদেশস্থ বিষম কেন্দ্রাতিগ গতিতে তদ্দেশ হইতে কুম্ভকারের চক্র ত্যক্ত মৃত্তিকা খণ্ডবৎ বাষ্পাণু খণ্ডাংশ হইয়া সমদিকে ও সমগতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ততোধিক স্থান ব্যাপিয়া বিভিন্নভাবে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এই সকল ক্ষুদ্রতর মণ্ডল হইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধ্য দেশাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলের সূত্রপাৎ হইয়াছে; এদিকে ক্রমাগত উত্তাপ বিকীরণে ও কেন্দ্রানুগতির প্রাবল্যে বাষ্পাণুসমূহ ক্রমে ঘনতা সঙ্কুচন ও গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান্বিত হইয়াছে। এদিকে ক্ষুদ্রতর গ্রহাংশগুলি সত্বর অধিকতর উত্তাপ বিকীরণ ও কেন্দ্রানুগগতির বশবর্ত্তীহেতু ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরল ও কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রহাদি পাদার্থিক নিয়মে আদিম সৌরমণ্ডল হইতে উদ্ভূত এবং সৌর ও নক্ষত্রমণ্ডল ঐরূপ আদি মহামিশ্রিত বাষ্পাণুরাশী হইতে উদ্ভূত। এদিকে হর্সেল প্রভৃতি দূরবীক্ষণ ও বর্ণবেক্ষণ সাহায্যে আকাশস্থ অনেক ঘনালোক (Nebula) পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন, ঘনালোকগুলিই গ্রহ নির্ম্মাণের মধ্যাবস্থা, ঘনালোকগুলি আবার নানাবিধ—কতকগুলি কেবল বাষ্পময় একেবারেই জড়ত্বহীন, অন্যান্য গুলিতে ক্রমশঃ অধিকতর জড়ত্বের আভাস বিদ্যমান, অতএব ঘনীভূত বাষ্প ক্রমেই জড়ীভূত হইতেছে, ইহাই প্রমাণিত হয়; উল্কাপাত, ধূমকেতু প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, জড় ঘর্ষণ ভরে উত্তাপোজ্জ্বল বাষ্পাণুতে পরিণত হয়—ইহা হইতেই পরবর্ত্তী প্রস্তর-বর্ষণ-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে, (Stone shower theory)। ঘনালোক সকল ক্রমে ঘনতা ও শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে নানা অবস্থায় বিদ্যমান, স্থিরনক্ষত্র সকল পরীক্ষা করিয়াও জড়ত্বে বিভিন্ন আদিম অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। শ্বেতালোক প্রায় জড়ত্বহীন, ঘনালোক সমতুল্য, আমাদের সূর্য্যের ন্যায় পীতালোক নক্ষত্রের কেন্দ্রদেশে সম্ভবতঃ জড়ত্ব বিদ্যমান এবং লোহিতালোক নক্ষত্রে জড়ত্ব নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত। সূর্য্যের উত্তাপ বিকীরণ দ্বারা ইহার ব্যাস বার্ষিক যে পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে যে ইহার অণু এককালে সমস্ত সৌর জগৎ বা ততোধিক স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, ইহা নিতান্ত সম্ভব।

ক্রমশঃ।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সিংহ সরস্বতী।

পান্থ।

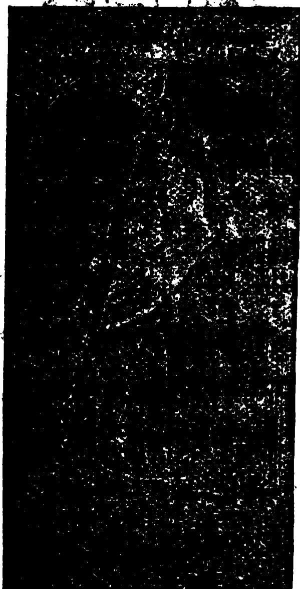
পথশ্রান্ত পান্থ কত বিশ্রাম আশায়
বসিল বিটপী ছায়ে ক্ষণেকের তরে ;
পরিচিত কেবা কার ? কোন দূরান্তরে
কোন দেশে কার বাস কে জানে কোথায় !
দূরান্তর দেশান্তর—সমবেদনায়
সহসা ভুলিল সবে নিমিষের তরে,
কত প্রীতি লয়ে পরে আপনার করে—
ক্ষণপরে—কে কোথায় লইল বিদায় !
এ সংসার—এও ছায়া—পান্থ সবি হায় !
আসিছে লভিছে স্নেহ নিগড়-বন্ধন—
ক্ষণমাঝে ভাগ করি দিয়ে আপনায়
ভাবিছে রহিবে চির এ মধু মিলন !
এত মোহ—এত ভ্রান্তি—এ মিথ্যা ছায়ায় !
কেন ভুলি, এ জীবন শিরায় স্পন্দন !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মেঘনাথ সর্দ্দার।—(বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ নবন্যাস।) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে-প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণ সুন্দর। বাঁধাই পরিপাটী। ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। এই সমালোচ্য পুস্তকের একদিকে সাধুবিদ্রোহী, নিরীহ-লোকপীড়ক, স্ত্রীহত্যাকারী, লম্পট, নর-পিশাচ,জমিদার রাজীবলোচনের হস্তে তাহার সাধ্বী স্ত্রী অন্নপূর্ণার নির্দ্দয়ভাবে হত্যা এবং পরিণামে সেই পাপের সমুচিত দণ্ড দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিজে আহতপন্ন ও ক্রোধানলে তাহার অকালমৃত্যুই প্রচুর পুরস্কার ! আর অপরদিকে ভূম্যধিকারী গিরীন্দ্রমোহনের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার আজীবন ধর্ম্ম-পরায়ণতা, উদারতা এবং দানশীলতার প্রভাবে তাঁহার জমিদারী স্বর্গতুল্য। গ্রন্থকারের রচিত এই স্থানটী সুন্দর হইয়াছে। তারপর সর্দ্দার 'মেঘনাথে'র চরিত্রই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কেননা 'মেঘনাথ' নীচবংশজাত ও অশিক্ষিত হইলেও তাহার চরিত্রে নীচতার লেশ নাই—ধৃষ্টতার ভাব নাই, কেবল জীবনের আগাগোড়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবলীলাক্রমে সে তাহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী 'নবদুর্গা'র সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের দাম্পত্য-প্রেমময় আত্মা দুইটীকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিপদে উৎসর্গ করিতে ভুলে নাই। আধুনিক উচ্চবংশীয় শিক্ষিত সমাজে এই নীচবংশজাত 'মেঘনাথে'র চরিত্রলাভে ও হরিভক্তিপরায়ণতায় কয়জন সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে ? স্বয়ং গ্রন্থকার লিখিত 'মেঘনাথ সর্দ্দার' এই পুরুষপুঙ্গবের নামই গ্রন্থের সমীচীন শীর্ষক বটে। বলা বাহুল্য, এই নবন্যাসখানি সাধারণের ও পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শীতল সাগর তৈল।



কেশতৈলের রাণী—সুষমা, সৌরভ ও আনন্দে ভরপুর। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও শক্তিশালী করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ! ইহা কেশরোগ দূর করে, শিরঃপীড়া নাশ করে, আর ঘন কৃষ্ণ মসৃণ কেশগুচ্ছে মস্তক শোভাময় করিয়া তুলে। যদি পুষ্পের মিষ্ট স্নিগ্ধ মনোরম গন্ধে গৃহ আমোদিত ও প্রাণ পুলকিত করিতে ইচ্ছা করেন, শীতল সাগর ব্যবহার করুন। ইহা গবেষণার সহায়,—ছাত্রের সুহৃদ, প্রিয়জনের মনোরঞ্জন।

প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

ইস্তাম্বুলের খাঁটি

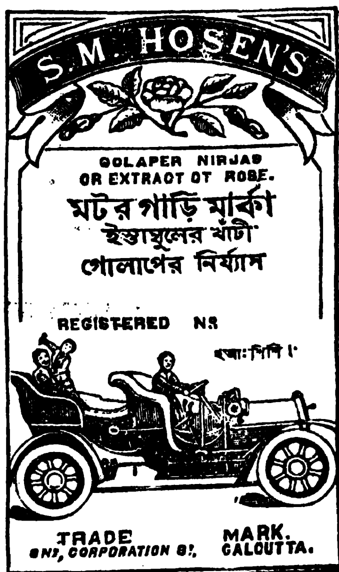
গোলাপের নির্য্যাস।

মটর গাড়ী মার্কা গোলাপের নির্য্যাস ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক শীতল ও মন-প্রাণ প্রফুল্ল হয়। আমরা ইস্তাম্বুলের খাঁটি গোলাপ চুয়াইয়া এই আরক প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা চক্ষু ও শিরোরোগে পরম উপকারী। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা মাত্র।

মহাসুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল। পাইণ্ট ৸০; ডজন ৭৲ টাকা।

এস, এম, হোসেন।

৮ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



৬।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মাণকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।